পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ

সাভারকর

সাভারকর

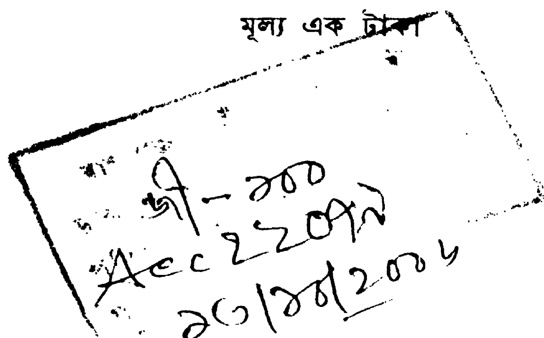
শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী



রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৮

মূল্য এক টাকা



শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৫'২—২৭।১১।৪১

ভূমিকা

ভারতবর্ষ চিরকালই বীরপ্রসবিনী। বীর সাভারকর ভারতমাতার এক উজ্জ্বলতম রত্ন। তাঁহার জীবনের দুইটি বিশিষ্ট অধ্যায় আছে। প্রকাশক সাভারকরের জীবনের এই দুইটি বিভিন্ন অধ্যায়ের সহিত বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন দুই বিভিন্ন লেখককে দিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়া বাঙালী জাতিকে সাভারকরকে বুঝিবার ও জানিবার সুযোগ দিয়া প্রত্যেক বাঙালী নর-নারীর কৃতজ্ঞভাজন হইয়াছেন। আমরা এই সাভারকর-জীবনীর বহুলপ্রচার কামনা করি। ইতি ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮ সাল।

৫ থিয়েটার রোড,
কলিকাতা

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মুখবন্ধ

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আমাদের কংগ্রেস অফিস-সংলগ্ন পান্থশালায় দিন কয়েকের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত ইংরেজীতে লিখিত সাভারকরের একটি জীবনী ছিল। তিনি যাইবার সময় আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থ-মন্দিরে সেই বইখানি দান করিয়া যান। বর্ত্তমান গ্রন্থের উপাদান মূলত সেই বইখানি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস অফিস ও তৎসংলগ্ন গ্রন্থ-মন্দিরে খানাতল্লাসীর ফলে অন্যান্য বহু পুস্তকের সহিত সেটিও পুলিসের হস্তগত হয়। সেই গ্রন্থের নাম অথবা তাহার দাতা বা রচয়িতার নাম কিছুই স্মরণ নাই; তবু স্মরণের পরপারের সেই দাতা ও রচয়িতার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞ অন্তঃকরণে ঋণ জ্ঞাপন করিতেছি।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি আমার লেখা শেষ হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে; ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অধুনালুপ্ত 'স্বাধীনতা' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাহার প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়। রাজরোষে পতিত হইয়া 'স্বাধীনতা' পত্রিকার আকস্মিক অপঘাত ঘটায় সাভারকরের জীবনী প্রকাশও বন্ধ হইয়া যায়। পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বাংলার বাণী' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় সমগ্র জীবনীটি প্রকাশিত হয়। তাহার পর এই দীর্ঘ সময় কাটিয়া গিয়াছে, রাজানুগ্রহ ও দৈবানুগ্রহজনিত বহুবিধ বিড়ম্বনার দরুন জীবনীটি গ্রন্থাকারে ছাপাইবার সুযোগ হয় নাই এবং হয়তো হইতও না—শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সৌহার্দ্দ্য যদি না লাভ করিতাম। তাঁহার এই অনুগ্রহের জন্য এবং আমার 'প্রতিধ্বনি' নামক অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিবার পক্ষে তিনি যে আন্তরিক

সাহায্য করিয়াছেন, তাহার জন্য শুষ্ক ধন্যবাদমাত্র জ্ঞাপন করিয়া কৃতজ্ঞতার ভার লঘু করিতে চাই না।

ভারতের বিপ্লবক্ষেত্রে সাভারকরের দান অমূল্য। তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মপদ্ধতির সহিত যদিও আমাদের মত মিলে না, তবু এ কথা স্বীকার না করিয়া পারি না যে, এখনও বর্ত্তমান ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকের গুণমুগ্ধ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে। এই কর্ম্মবীরের জীবনকথা যদি পাঠকসাধারণের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে, তবেই শ্রম সার্থকজ্ঞান করিব। ইতি—

জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ,
১৪ই জুলাই, ১৯৪১

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীযুক্ত জগদানন্দ বাজপেয়ী মহাশয় সাভারকরের জীবনী যেখানে শেষ করিয়াছেন, তাহার পরে তাঁহার কার্য্যাবলী এক সম্পূর্ণ নূতন খাতে বহিয়া চলিয়াছে। হিন্দু মহাসভাকে বাদ দিলে, সাভারকর অসম্পূর্ণ থাকিয়া যান, সেইজন্য সেই অংশটুকু যোগ করিয়া দেওয়া হইল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্তের নিকট এজন্য আমরা ঋণী।

শৈশব ও কৈশোর

বিপ্লবীর আবার বংশ-পরিচয় কি? কক্ষচ্যুত উল্কা যখন বিচ্ছুরিত হইয়া লক্ষ্যহীন বেগে ছুটিয়া চলে, বিস্মিত বিশ্ববাসীর বিমূঢ় দৃষ্টি অপলক আগ্রহে তাহারই অনুসরণ করে; কবে কোথা হইতে তাহার যাত্রা শুরু হইল, সে তথ্য নির্ণয়ের অবকাশ থাকে না। বিপ্লবী স্বয়ং সেইরূপ আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ এক বিরাট বিস্ময়। নিজেকে পরিস্ফুট করিবার জন্য সে অপর কোন আলোকপাতের অপেক্ষা রাখে না, স্তম্ভিত জগৎবাসীর অখণ্ড মনোযোগ এমন পরিপূর্ণরূপে সে আত্মস্থ করিয়া লয় যে, সেই মহাশক্তির উৎস-অনুসন্ধানের কাহারও অবসর থাকে না, বোধ করি আবশ্যকও থাকে না। তাহারই বিচ্ছুরিত আলোকপাতে অখ্যাত-বংশ ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন পত্রগুলি অনুরঞ্জিত হইয়া উঠে।

বিপ্লবীর জীবন অধ্যয়নে জাতি গোত্র বা পিতৃ-পরিচয়ের সার্থকতা কি? সে তো কোন বংশানুগত সংস্কারধারার স্বাভাবিক পরিণতি নয়। আকস্মিক তাহার উদ্ভব, বিচিত্র তাহার বিকাশ, উদ্দাম তাহার বেগ, উচ্ছৃঙ্খল তাহার গতি। বংশানুগত সহজ শোণিতস্রোত স্বচ্ছন্দ গতিপথে সহসা মোচড় খাইয়া বুঝি বিপ্লবীর জীবনে আবর্ত্তিত হইয়া উঠে, আর সেই আবর্ত্ত-গর্ভে কোথায় বিলীন হয় বংশানুক্রমিক

প্রথাপদ্ধতি, শিক্ষা ও সংস্কার! অসংখ্য জ্যোতিষ্করাজি অসীম মহাশূন্যে নিয়ত ঘূর্ণ্যমান; নির্দ্দিষ্ট নিয়মে তাহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি, নির্ণীত সময়ে তাহাদের উদয়-অস্ত, চিহ্নিত পথে পরিভ্রমণ। কিন্তু ধূমকেতুর আবির্ভাব-তিরোভাব কোনও নিয়মের অধীন নয়। প্রলয়-পুচ্ছ আলোড়ন করিতে করিতে স্বেচ্ছায় সে আকাশের বক্ষে ছুটিয়া আসে, স্বেচ্ছায় চলিয়া যায়; জ্যোতিষশাস্ত্রের সূক্ষ্মতম স্ফুটবিচারক অক্ষম শিশুর মত তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার লক্ষ্য করে। অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীগণের চরিত্র বিস্ময়ের সামগ্রী হইলেও দুর্ব্বোধ্য নয়, এবং দুর্ব্বোধ্য নয় বলিয়াই তাহা পরিমেয়। কিন্তু বিপ্লবীর চরিত্র এমন অসংলগ্ন, এমন সামঞ্জস্যহীন, তাহার কার্য্যকলাপ এমন অসঙ্গত এবং পারম্পর্য্যবিহীন যে, অতিদূরপরিণামদর্শী সূক্ষ্মতম বিষয়বুদ্ধিও তাহার পরিমাপ করিতে গিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। তাই পৈতৃক বা কৌলিক কোন পরিচয়ই বিপ্লবীর চরিত্র অনুধাবনে কোন সাহায্য করে না। বিপ্লবীর কোন জাতি নাই, ধর্ম্ম নাই; সাধারণত মানবিকতা তাহার জাতি, ধ্বংস তাহার ধর্ম্ম; বিপ্লবীর মাতা নাই, পিতা নাই; নিপীড়িত গণ-নারায়ণের বুঝি সে মানস-সন্তান। ইহাই সাধারণ নিয়ম; কিন্তু অপর সকল নিয়মের মত ইহাও ব্যতিক্রম।

যে বিপ্লব নায়কের জীবন-নাট্যের উপর বিলম্বিত যবনিকাখানি উত্তোলিত হইবার অধীর আগ্রহে ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসুক দৃষ্টির সম্মুখে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, অন্তরাল মুক্ত হইলেই দেখিতে পাইব, বংশগত সংস্কারধারার সহিত এই কর্ম্মীর বিচিত্র জীবনের অসঙ্গতি নাই, বরং সঙ্গতিই আছে।

গর্ব্বিত মারাঠা-জাতির মন্ত্র-গুরু প্রথম পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ, অদ্বিতীয় সমরকুশল সেনাপতি বাজীরাও, সূচ্যগ্রবুদ্ধি চতুর রাজনীতিক

নানা ফার্‌নাভিস, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের 'স্বাধীনতা'-যুদ্ধের অধিনায়ক নানা সাহেব, পুণার প্লেগ-নিবারণী সমিতির ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীর হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ও রাণাডে, শ্রীযুক্ত গোখেল, জাষ্টিস রাণাড়ে এবং মহারাষ্ট্রকেশরী দেশমান্য তিলক প্রমুখ অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন পুরুষগণ যে বংশের সন্তান, বিনায়করাও সাভারকর চিতপবন-শ্রেণীয় সেই মারাঠী ব্রাহ্মণ-কুলে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভারত হইতে ইংরেজ রাজত্ব উচ্ছেদ করিবার জন্য গোপন বা প্রকাশ্য যত আন্দোলন হইয়াছে, এই চিতপবন-কুলের কোন না কোন সন্তানের নেতৃত্বাধীনেই তাহা পরিচালিত হইয়াছে; তাই এই বংশ কুর্জন সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ইংরেজ রাজপুরুষগণের চক্ষুশূল হইবে, আশ্চর্য্য নহে! তাহাদের রিপোর্টেও এই বংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বিনায়করাও দামোদর সাভারকর মধ্যম পুত্র। তাঁহার আর দুই ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ গণেশরাও এবং কনিষ্ঠ নারায়ণ। এই তিন ভ্রাতার কর্ম্মতৎপরতা ভারতীয় বিপ্লব-ইতিহাসে তাঁহাদিগকে "সাভারকার ব্রাদার্স" নামে বিখ্যাত করিয়াছে। বিনায়ক বাল্যকাল হইতেই ভাবপ্রবণ ও উচ্চাভিলাষী, তাঁহার পিতার কবিতার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাই জন্মাবধি এই কাব্যপ্রীতি পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত হয়। দামোদর কখনও রামায়ণ মহাভারত হইতে, কখনও বা হোমার বা পোপ হইতে, আবার কখনও বা ভামার মোরোপন্ত বা তুকারামের মারাঠী সাহিত্য হইতে নির্ব্বাচিত কাব্যাংশ যথাযথ ভাব-অভিব্যক্তির সহিত সুললিত কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া যাইতেন; পদতলে শিশু-পুত্র তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিত, মুখে তাহার দীপ্ত প্রসন্নতা, চক্ষে এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশ। শুনিতে শুনিতে ভাবোন্মাদ শিশু-চিত্ত কোন্ সুদূর স্বপ্ন-লোকের আলো-ছায়ার মাঝে আপনাকে হারাইত।

এই সকল কাব্যগ্রন্থ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বালকের স্বভাবজাত কাব্যানুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে সে আর শুধু শ্রবণে সন্তোষ মানিল না, রচনায় প্রবৃত্ত হইল। বিনায়কের বয়স তখন মাত্র দশ বৎসর। এই অল্প বয়সে রচিত কবিতাগুলি মহারাষ্ট্রের তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকাসমূহে সাদরে গৃহীত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। সম্পাদকগণ জানিলেন না যে, সেই কবিতাগুলির রচয়িতা একটি দশ বৎসর বয়স্ক সুকুমারমতি বালক।

বিনায়কের অধ্যয়নস্পৃহাও ছিল অসাধারণ। একটি নির্জ্জন কক্ষের এক অপরিচ্ছন্ন টেবিলের উপর মহাভারতের মারাঠী সংস্করণ, তিলকের 'কেশরী' পত্রিকার কয়েক খণ্ড, চিপলঙ্কার রচিত নিবন্ধমালা, মহারাষ্ট্রের গৌরবময় যুগের গরিমাগাথা প্রভৃতি জাতীয়ভাবোদ্দীপক অমূল্য গ্রন্থরাজি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; বিনায়ক বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইয়া তাহারই মাঝে অধ্যয়ন-মগ্ন, এই সকল জাতীয়-সাহিত্যসমৃদ্ধ ভাবভাণ্ডার, এই সব কাব্যকুসুম-আহৃত অমৃতভাণ্ড বিনায়ক স্বার্থপরের মত সঙ্গোপনে একা ভোগ করিতেন না, সহপাঠী ও ক্রীড়া-সহচরদিগের মধ্যে মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেন। বিনায়ক যখন মহারাষ্ট্রের বীরত্ব-কাহিনী, রাজস্থানের গৌরব-কথা, বক্তার ন্যায় ওজস্বিনী ভাষায় বলিয়া যাইতেন, বিস্মিত সহচরগণ মুগ্ধনেত্রে তাঁহার ভাবদীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। বালকদের মন লইয়া তিনি যাদুকরের ন্যায় যথেচ্ছ খেলা করিতেন। কখনও বা পরাধীন ভারতের দুঃখ-দুর্গতির করুণ কাহিনী এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করিতেন যে, তাহাদের নিরুদ্ধ অশ্রুর উৎস স্বতই উৎসারিত হইত, অশ্রুসজল নয়নে বহ্নিজ্বালা খেলিয়া যাইত, দুর্দ্দশা-মোচনের দারুণ প্রতিজ্ঞা অজ্ঞাতসারে কখন যে উচ্চারিত হইত, তাহারা নিজেই বুঝিতে পারিত না। আবার পরক্ষণেই স্বাধীন

ভারতের ভাবী সুখ-সমৃদ্ধির চারু চিত্র এমন নিপুণতার সহিত তাহাদের চোখের সামনে ফুটাইয়া তুলিতেন যে, অশ্রুসিক্ত সুকুমার মুখগুলি আশা ও আনন্দের স্নিগ্ধ আলোকসম্পাতে প্রভাত-পদ্মের মত মধুময় হইয়া উঠিত।

দশ বৎসর বয়সে বিনায়ক মাতৃহীন হয়। দামোদর পুত্রদিগকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতেন, কাজেই দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি পিতারূপে তাহাদের শিক্ষাদান ও চরিত্রগঠন এবং মাতারূপে পাক, পরিচর্য্যা দ্বারা লালন-পালন করিয়া, একাধারে মাতা ও পিতার কর্ত্তব্য হাসিমুখে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। পিতার এই বুকভরা অগাধ স্নেহ পুত্রদিগকে একদিনের জন্যও মাতার অভাব বোধ করিতে দেয় নাই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসরই পুণায় ভারতের জাতীয় মহাসমিতির স্মরণীয় অধিবেশন; যে 'শিবাজী' ও 'গণপতি' উৎসব মারাঠী জাতিকে স্বাধীনতার উন্মাদনায় মাতাইয়া তুলিয়াছিল, এই বৎসরেই তাহার প্রবর্ত্তন। মহারাষ্ট্রের নব-জাগরণের এই চাঞ্চল্য ভারতের দূরতম প্রদেশেও আঘাত করিয়াছিল; ফলে দেশব্যাপী এক মহা-আন্দোলনের উদ্ভব হইয়াছিল। বিনায়কের বয়স এই সময় চোদ্দ বৎসর। ভারতের যেখানে যে কোন আন্দোলন হউক, তাহার প্রতিটি তরঙ্গ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়-তটে আঘাত করিত। প্রতিদিন প্রভাত হইতে না হইতে বিনায়ক সংবাদপত্রের প্রত্যাশায় ডাকঘরের সম্মুখে পদচারণা করিতেন, এবং পত্রিকা হস্তগত হইবামাত্র বুভুক্ষুর মত সংবাদগুলি গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেন। এমন সময় হঠাৎ একদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখা গেল যে, ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলী উৎসবের দিন পুণায় অবস্থিত প্লেগ-নিবারণী সমিতির

ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীকে কে বা কাহারা অতি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে। সরকার স্থির করিলেন যে, ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক খামখেয়াল নয়, পরন্তু কোন সুনিয়ন্ত্রিত বিপ্লব-সমিতির সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালী, এবং রাজকীয় উৎসব-অনুষ্ঠান ব্যর্থ করাই হইল এই হত্যাকাণ্ডের মুখ্য উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে দেশময় খানাতল্লাস ও ধর-পাকড়ের ধুম পড়িয়া গেল। সন্দেহক্রমে নাটু-ব্রাদার্স ও তিলক গ্রেপ্তার হইলেন ও নির্ব্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। দ্রাবিড়গণ 'চাপেকার-ব্রাদার্স'কে ধরাইয়া দেয়, এবং তাঁহারা নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য কনিষ্ঠ চাপেকার ও রাণাডে দ্রাবিড়-দিগকে হত্যা করিলেন। পর পর এতগুলি বিস্ময়কর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সারাদেশ যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া হাঁপাইয়া উঠিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে অতি জঘন্য চরিত্রের নরহত্যাকারীরূপে উচ্চকণ্ঠে নিন্দা করিলেন। নরহত্যার সমর্থন কেহ করিতে পারে না, কিন্তু তথাপি কেহ কেহ ঐ চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রাণোৎসর্গকারী বীররূপে মনে মনে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে প্রকাশ, বিনায়কও এই শেষোক্ত দলের অন্যতম।

অবশেষে একদিন চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ও রাণাডের প্রাণদণ্ডের শোচনীয় সংবাদ প্রকাশ হইল। ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া তাঁহারা স্নান, পূজা ও প্রার্থনা করেন; প্রার্থনান্তে, ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী ভগবদ্গীতা হাতে লইয়া হাসিতে হাসিতে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করেন—ইহাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল।

এই সকল বীরত্বের অথবা নির্ভীকতার কাহিনী বিনায়কের হৃদয়কে এমনই আলোড়িত করিল যে, তিনি অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না।

পরবর্ত্তী কালে প্রকাশ, যে কারণেই হউক, এই ভাবপ্রবণ কিশোর

বিনায়ককে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের এই ফাঁসির সংবাদ বিচলিত শুধু নহে, ঐ পথেই আকর্ষণ করিয়াছিল।

নরহত্যার প্রতি যে ঘৃণা স্বাভাবিক—নরহত্যাকারীকে যে ঘৃণার চক্ষে দেখা স্বাভাবিক, তাহার ব্যতিক্রম এই বিপ্লবীর মধ্যে হঠাৎ কেন দেখা দিল বলা শক্ত; তবে বিপ্লবীর জীবনই একটা নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া হয়তো ইহা সম্ভব হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক, এই অস্বাভাবিক জীবনের ভাবী কালের কার্য্যাবলী কেমন করিয়া দেখা দিল, আমরা শুধু তাহারই পরিচয় দিব।

দেশকে বড় করিব, দেশের জন্য আত্মত্যাগ করিব, দেশের কার্য্যে সমস্ত ব্যক্তিগত ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিব, এই ভাবের অনাবিলতা এই কিশোর-হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করিয়াও এক সৃষ্টিছাড়া লক্ষ্মীছাড়া সুধীজন-নিন্দিত দুর্গম পথে যে কেন টানিয়া লইল, ইহা বলা শক্ত। কিন্তু যাহা সমর্থন করা শক্ত, সেখানেও শক্তির প্রকাশ দেখিলে মানুষের পক্ষে তাহা লক্ষ্য না করিয়া উপেক্ষা করা শক্ত। বিপ্লবীর পরবর্ত্তী জীবনে হয়তো তাহাই দেখা যাইবে। যাহাই হউক, বিনায়ক নব স্বপ্নে বিভোর হইলেন। নিজের ভাবে নিজে শুধু নহে, অপরকেও অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গ্রামের যুবকদল তাঁহার নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাইয়া তুলিবার জন্য স্বগ্রামে 'শিবাজী' ও 'গণপতি' উৎসবের প্রবর্ত্তন করিলেন। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের হাসিমুখে মরণ-বরণের সেই মহিমময় দৃশ্য এখনও বিনায়কের চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন, এই ঘটনা অবলম্বনে এমন এক উদ্দীপনাময়ী কবিতা রচনা করিবেন, যাহা পাঠ করিলে সহকর্ম্মীদের তরুণ মন মরণ-উন্মাদনায় মাতিয়া উঠিবে। একদিন গভীর রাত্রিতে দামোদর দেখিলেন, বিনায়কের

শয়ন-গৃহের দ্বার ঈষৎ উন্মুক্ত, ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিতেছে। সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, বিনায়কের অতি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বালক বাহ্যজ্ঞানবিরহিত, সম্মুখে একটি অসমাপ্ত কবিতা পড়িয়া রহিয়াছে, বিনায়ক কখনও আপন মনে অনুচ্চকণ্ঠে কবিতার কোন একটি চরণ উচ্চারণ করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই নূতন একটি চরণ তাহাতে সন্নিবিষ্ট করিতেছেন। দামোদর অৰ্দ্ধসমাপ্ত কবিতাটি পাঠ করিয়া চমকিত হইলেন, ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, কবিতা রচনা করিতেছ ভাল কথা, কিন্তু বিষয়নির্ব্বাচনে মস্ত একটা ভুল করিয়াছ। তুমি এখন সুকুমারমতি বালক, এই সকল গভীর ও গুরুতর বিষয়ের আলোচনা এখন কি সাজে? তাহাতে ফললাভ তো কিছুই হইবে না। তবে অযথা চিন্তা ও কল্পনাশক্তিকে ভারাক্রান্ত করা কেন? কেন অকারণ শান্তির সংসারে রাজ-রোষ ডাকিয়া আন? যাও, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, এই সকল গভীর বিষয়ের আলোচনা ভাবী কালের জন্য স্থগিত রাখিয়া শয্যায় যাও। স্নেহবশেই হউক, মতের পরিপক্কতার জন্যই হউক, আর বয়োধর্ম্মেই হউক দামোদর অবশ্যই আজ বিস্মৃত হইলেন যে, মৃদু তিরস্কারে পুত্রকে আজ যে পথ হইতে বিরত হইবার জন্য তিনি উপদেশ দিতেছেন, কে তাহাকে সে পথে চলিতে প্রবৃত্তি দিল! দামোদর নিজে তিলকের অন্ধ ভক্ত, কতদিন বিনায়ক পিতার পদতলে বসিয়া তিলকের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিয়াছে। আজ যদি তিনি তাঁহার জীবন সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে গিয়া কৈশোরের অসংযত গতিবেগে পিতার ধারণার সীমা লঙ্ঘন করেন, তবে পিতার তাহাতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ থাকিলেও ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। ইহাতে দেখা যায়, যুগে যুগে, দেশে দেশে শত শত রাষ্ট্রনায়কের উত্থান ও পতন। কোন চিন্তাশীল

মনীষী হয়তো দেশে এক নবভাবের বন্যা আনিলেন, কর্ণধাররূপে জাতীয় জীবন-তরণী সেই ভাবধারায় ভাসাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই স্রোতপথেই সবাই যাত্রা করিবে। কিন্তু যৌবনের অপরিমেয় প্রাণ-শক্তির বেগে সেই ভাবপ্রবাহ যখন উদ্দাম হইয়া উঠিল, যখন "তরী করে টলমল পসরাতে উঠে জল", আপন সৃষ্টির মহান বিস্ময়ে অভিভূত কর্ণধার সে স্রোতোবেগ আর সংযত করিতে পারিলেন না, তখন যে কণ্ঠের কম্বুনির্ঘোষে একদিন ভাবগঙ্গোত্রী নামিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে ধ্বনিয়া উঠিল, 'থাম, থাম! সম্বর, সম্বর!'

ঠিক এই সময়ে পুণায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল। যে গ্রাম বা নগরে এই কালব্যাধি একবার প্রবেশ করিল, তাহাই শ্মশানে পরিণত হইল। কিন্তু এহেন মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ অপেক্ষা প্লেগ-নিবারণী সমিতির সরকারী কর্ম্মচারীগণ জনসাধারণের চক্ষে আরও বেশি ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইল, যে প্লেগের আক্রমণে মারা গেল সে তো মরিয়া বাঁচিল, যাহারা বাঁচিয়া রহিল তাহাদের আর কষ্টের অবধি রহিল না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সদাশয় সরকারী কর্ম্মচারীগণ আসিয়া বাড়ি অধিকার করিয়া বসিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহাদিগকে ঘরবাড়ি আসবাবপত্র এমন কি মৃত আত্মীয়কে পর্য্যন্ত তাহাদের হাতে সঁপিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া কোন পরিত্যক্ত কুটীরে, মন্দিরে অথবা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কিছুদিন পরে তাহারা আবার যখন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিল, তখন গৃহস্থালী অনেকটাই হাল্কা দেখা যাইত। জনসাধারণের এই "জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ"-গোছের উভয়সঙ্কট অবস্থা বিনায়কের কাব্যের খোরাক যোগাইয়াছিল। এই অবস্থাটিকে রূপ দিবার জন্য তিনি একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কবি তখন কল্পনাও করেন নাই যে,

সে অবস্থার সহিত এত শীঘ্র তাঁহারই প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিবে। সহসা দামোদর একদিন প্লেগে আক্রান্ত হইলেন, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই চারিটি মাতৃহীন, সহায়সম্পদহীন পুত্রকন্যা রাখিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। সরকারী 'নোকর'-হস্তে মৃত পিতার শবদেহ সমর্পণ করিয়া সাভারকার-পরিবারকে গ্রামপ্রান্তে এক ভগ্ন দেবালয়ে আশ্রয় লইতে হইল। সেখানে বিনায়কের এক খুল্লতাত ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোগাক্রান্ত হইলেন। বিনায়ক, গণেশ ও গণেশের স্ত্রী—এই তিনজন রাত্রিদিন রোগীদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিলেন। শেষে তাঁহার খুল্লতাত দেহত্যাগ করিলেন। এই দুঃসময়ে বিনায়কের এক বন্ধু নাসিক হইতে তাঁহাদিগকে স্বগৃহে সাদরে ডাকিয়া লন। সেখানে গণেশ পীড়িত ভাইটিকে লইয়া হাসপাতালে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং বিনায়ক ও তাঁহার ভ্রাতৃজায়া শহরেই রহিলেন। নাসিক শহরও তখন প্লেগের আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল না। জনহীন পরিত্যক্ত নগর যেন শ্মশান-দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। যে কয়জন লোক জীবিত আছে, আসন্ন মৃত্যুর পদশব্দ শুনিবার জন্য তাহারা যেন মৌন উৎকণ্ঠায় উৎকর্ণ। কি জানি কাহার কুহকে আজ পথকুক্কুরেরও যেন কণ্ঠ রুদ্ধ! সন্ধ্যার অন্ধকারে জনশূন্য নগরের পথিকহীন রাজপথ বাহিয়া বিনায়ক চলিয়াছেন হাসপাতাল অভিমুখে দাদার আহার্য্য-সামগ্রী বহন করিয়া। সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শববাহকদের বীভৎস কণ্ঠ হাঁকিয়া উঠিল, "রাম বোলো ভাই রাম।" বিনায়কের সারাদেহ এক অজানা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, পরক্ষণেই আবার সব নিস্তব্ধ, সে নীরবতা আরও নিবিড়তর, অন্ধকার আরও গভীরতর।

একদিন হাসপাতালে গিয়া অভ্যাসমত বিনায়ক বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন দাদার আগমন প্রতীক্ষায়। বহুক্ষণ অতীত হইল, গণেশ কিন্তু

আসিলেন না। প্রতিক্ষণে অমঙ্গলের আশঙ্কায় বিনায়কের বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। অবশেষে সংবাদ আসিল—গণেশ আক্রান্ত হইয়াছেন। এ আঘাত সহ্য করিবার মত শক্তি বিনায়কের ছিল না, কাজেই সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া অশ্রু-উৎস কূল হারাইল।

এই দারুণ দুঃসংবাদ শুনিয়া ভ্রাতৃজায়া বিহ্বল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু দেবরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নিজের শোক ভুলিয়া তাঁহার সান্ত্বনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যাহা হউক অল্পদিনের মধ্যেই গণেশ ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোগমুক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন সাভারকর-পরিবারের সুখ-শান্তিও ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি তাঁহারা স্বগ্রামে ফিরিয়া না গিয়া নাসিকেই বসবাস করিতে লাগিলেন।

এত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও দৈবদুর্ব্বিপাকের মধ্যেও বিনায়ক তাঁহার লক্ষ্যচ্যুত হন নাই। আত্মস্থ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্বকার্য্যে আবার আত্মনিয়োগ করিলেন। নাসিকেও এই যুবকের চরিত্রমাধুর্য্যে ও ব্যক্তিত্বপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যুবকদল সম্মিলিত হইতে লাগিল। এই সম্মিলিত তরুণ-সঙ্ঘের নাম রাখা হইল—"মিত্র-মেলা"। পরে প্রকাশ, সঙ্ঘের পদ্ধতি ছিল দ্বিবিধ—প্রকাশ্য এবং গোপন। প্রকাশ্য শাখার কার্য্য ছিল—জনমত গঠন করা, দেশে দেশে ও গ্রামে গ্রামে যুব-শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করা, নানাবিধ উৎসব ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা-লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তোলা, শিক্ষার বিস্তার ও দেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন ইত্যাদি, আরও কত কি!

আর গোপন শাখার উদ্দেশ্য ছিল—অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী গঠন করা, এবং সুযোগ বুঝিলেই সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা ভারতকে

বৈদেশিক শাসন-পাশ হইতে মুক্ত করা। বিনায়কের অক্লান্ত চেষ্টায়ই হউক বা যুবকদের ইহা ভাল লাগিত বলিয়াই হউক, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সমিতি শত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র মহারাষ্ট্র ছাইয়া ফেলিল।

সঙ্গে সঙ্গে গবর্মেণ্টের সজাগ দৃষ্টি মহারাষ্ট্রের বুকে এই দৃঢ়নিষ্ঠ কর্ম্মী-সঙ্ঘের কর্ম্মতৎপরতা অতি সতর্ক ও সন্দিগ্ধ ভাবে অনুসরণ করিয়া চলিল।

ছাত্র-জীবন, পুণা

বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা, চর্চ্চা, এবং বহুমুখী কর্ম্মতৎপরতা কিন্তু বিনায়ককে কোন দিন পাঠে অমনোযোগী করিতে পারে নাই। তাই ছাত্র-জীবনে অকৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহার কোন দিনই পরিচয় ঘটে নাই। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিনায়ক স্থির করিলেন, পুণায় ফার্‌গুসান কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবেন। ইহা তাঁহার একটি ইচ্ছা হইলেও, পুণা গমনের তাঁহার একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল। পরে তাহা প্রকাশ পায়। নাসিক পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে, তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার বন্ধু, সতীর্থ ও সহকর্ম্মীগণ এক সভা আহ্বান করেন। সভাটি যুবকদের দ্বারা আহূত হইলেও, নাসিকের বহু গণ্যমান্য ও পদস্থ ব্যক্তি তাহাতে যোগদান করিয়া যুবকদিগকে উৎসাহিত করেন এবং বিনায়কের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগের পরিচয় দেন। ইহা হইতে একটি কথা বেশ বুঝা যায় যে, বিনায়ক শুধু যুবকদেরই প্রিয় ছিলেন তাহা নয়, সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের হৃদয়েই তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিয়াছিলেন। তাই আসন্ন বিচ্ছেদের ছায়াপাতে সভাস্থ সকলের মুখই বিষণ্ণ ও ব্যথাতুর। বিনায়কের চিত্তও স্থির ছিল না। এক দিকে কৈশোরের ক্রীড়াভূমি শত সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত নাসিকের মায়া, অপর দিকে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রের দুর্নিবার আকর্ষণ; এই দুই বিরোধী ভাবের সংঘাতে বিনায়কের মন আন্দোলিত, তাই সভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া সেদিন ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তথাপি সে কণ্ঠে যে বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, তাহা বিরহ-ব্যথাতুর হৃদয়ের লঘু উচ্ছ্বাস নয়, স্বার্থপর সংসার-বুদ্ধির শুধু 'আত্মোন্নতি'র সুখকল্পনা নয়; তাহা তদ্গতপ্রাণ দেশপ্রেমিকের ভাবী কর্ম্মপদ্ধতির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। সহকর্ম্মীদিগকে সম্বোধন করিয়া বিনায়ক বলিলেন, বন্ধুগণ! আমাদের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং যত্ন সত্ত্বেও মিত্র-মেলার পরিধি আজ পর্য্যন্ত বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই; আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা আজও নাসিক জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আজ আমি শৈশবের খেলাঘর ছাড়িয়া যেখানে যাইতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা মহারাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থীগণের মহাতীর্থ। সমগ্র মহারাষ্ট্রে এমন গ্রাম নাই, যেখান হইতে অন্তত একজন ছাত্রও তথায় সমাগত না হইয়াছেন। এক কথায়, পুণার ফার্গুসান কলেজ মহারাষ্ট্রের স্নায়ুকেন্দ্র। সেখানে যদি একবার আমাদের ভাবধারা ঢালিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সহস্র শিরা-উপশিরামুখে বিরাট দেশ-দেহের দূরতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া পড়িবে। আজ যাঁহারা ছাত্ররূপে তথায় সমাগত, তাঁহারাই একদিন অঙ্গুলিহেলনে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনা করিবেন। কাজেই এখন হইতেই যদি আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে পারি, আমাদের আদর্শে গড়িয়া লইতে পারি, কালে তাঁহারাই এক এক জন দেশনায়ক হইবেন। তখন দেশব্যাপী

স্বাধীনতা-আন্দোলন উপস্থিত করা দুঃসাধ্য হইবে না। বন্ধুগণ, ইহাই আমার পুণা গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অতঃপর বিনায়ক ফারগুসান কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে অধ্যয়নের চারি বৎসরকাল বিনায়ক কিন্তু যে কোন সম্ভবপর উপায়ে মহারাষ্ট্রের তরুণ প্রাণগুলিকে বৈদেশিক শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন, এবং তাঁহার সে প্রচেষ্টা যে বহুলপরিমাণে সফল হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পুণায় ছাত্র-জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বিনায়কের অধ্যয়ন-স্পৃহা ছিল অসাধারণ, এখন তাঁহার বয়স যদিও দ্বাবিংশতি পূর্ণ হয় নাই, তথাপি এই অল্পবয়সেই পৃথিবীর বিপ্লব-ইতিহাস তাঁহার কৌতূহলী দৃষ্টির অনুসন্ধিৎসা হইতে একটি পত্রও প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে নাই। এই বিপ্লব-সাহিত্য-মন্থনে যে বিষ উত্থিত হইয়াছিল, তাহা অনুলিপ্ত হইয়াছিল তাঁহার রসনায়, তাই সে রসনা-নিঃসৃত প্রতিটি বাক্য শ্রোতার মর্ম্মে দংশন করিয়া বিষজ্বালায় বিবর্ণ করিয়া তুলিত, তাঁহার এই অসাধারণ বাগ্মিতা, এবং অসামান্য ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার আকর্ষণে যুবকদলকে টানিয়া আনিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে এখানেও তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এক সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল। সাধারণ যুবকদল হইতে এই সঙ্ঘের সভ্যগণ ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সাধারণ যুবকগণ যখন আমোদ-প্রমোদে অথবা চপল হাস্য-পরিহাসে অবসর বিনোদন করিত, ইঁহারা তখন হয়তো কোন নির্জ্জন দেবালয়ের নিভৃত কক্ষে বসিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা দেশোদ্ধারেরই সুখ-স্বপ্নে বিভোর। সুবেশ-সজ্জিত শৌখিন যুবকদল যখন নগরীর রম্য উদ্যানে পদচারণা করিয়া বায়ুসেবন করিত, ইঁহারা তখন স্বাধীন মহারাষ্ট্রের কোন এক ভগ্ন গিরি-দুর্গের ধ্বংস-স্তূপে

সমাসীন—অশ্বত্থ যেমন ভগ্ন-প্রাচীর-রন্ধ্রে সহস্র মূল প্রবেশ করাইয়া দিয়া জীবন-রস আকর্ষণ করে, সবান্ধব বিনায়ক তেমনই অতীত কীর্ত্তির ভগ্ন-স্তূপ হইতে স্বাধীনতার প্রেরণা আহরণ করিত।

অমিতকালমধ্যে পুণার যাবতীয় ছাত্র-সভা ও সমিতিগুলি সাভারকর-সঙ্ঘের করায়ত্ত হইয়া পড়িল। এই যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিনায়কের কণ্ঠ কলেজ-কক্ষে দিন দিন অনল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। সে আগুনে পোড় খাইয়া ছাত্রদের চরিত্র যে আকারে গড়িয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, অথচ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার মত প্রত্যক্ষ কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলেন না। তাহারা যথানিয়মে পড়ে, যথাসময়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, নিয়মিত ব্যায়াম করে, পুরুষোচিত ক্রীড়া-কৌতুকে আনন্দ পায় এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে; অনাড়ম্বর তাহাদের বেশ, দেশোদ্ধার তাহাদের স্বপ্ন এবং রাজনীতি তাহাদের আলোচনা। ইহাদের মধ্যে কোনটাই গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না, অথচ মোটামুটি তাহাদের আচরণে এমন একটা অস্বাভাবিকতা ছিল, যাহা সাধারণ ছাত্র-চরিত্রে ক্বচিৎ পরিলক্ষিত হয়। কখনও আদর এবং কখনও শাসনের দ্বারা তাহাদের সংস্কার সাধনের বিস্তর চেষ্টা হইল, কিন্তু বিশেষ কোন ফলোদয় হইল না। ভ্রূকুটি এবং ভালবাসা উভয়ই উপেক্ষা করিয়া তাহারা কিন্তু আপনাদের বাছাই-করা পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। কোটি কণ্ঠের কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত না করিয়া রাজশক্তি যেদিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হইল, নিরস্ত্র জাতি সেদিন আমলাতন্ত্রকে সংযত করিবার জন্য যে অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল, তাহাই 'স্বদেশী

আন্দোলন' নামে জাতীয় ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সে চাঞ্চল্য বাংলায় উদ্ভূত হইয়া, দেখিতে দেখিতে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রও সে আন্দোলন-তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিল। তীরে বসিয়া ঢেউ গণনা করা বিনায়কের স্বভাব নয়, তিনি সদলবলে তরঙ্গবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এ সময়ে কলেজের গ্রীষ্মা-বকাশ; কাজেই বিনায়ক স্থির করিলেন যে, দেশবাসীকে বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণে বাহির হইবেন। পুণা, নাসিক প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে উপর্য্যুপরি বহু সভার অধিবেশন হইল। প্রতি সভায় সহস্র সহস্র লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিনায়কের বক্তৃতা শুনিত। ক্রমে মহারাষ্ট্রের নিভৃততম পল্লী হইতেও বক্তৃতা দিবার জন্য বিনায়কের আহ্বান আসিতে লাগিল। এমন দিনও গিয়াছে, যেদিন উপর্য্যুপরি চার-পাঁচটি জনসভায় তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। বিদেশী বস্ত্রের প্রতি দেশবাসীর মনে তীব্র বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার জন্য বিনায়ক বিদেশী বস্ত্রের এক বহ্ন্যুৎসব অনুষ্ঠান করিতে মনস্থ করিলেন। সে যুগে এ কল্পনা দুঃসাহসিক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক, কাজেই জনসাধারণের অনুমোদন লাভ করিল না। এমন কি লোকমান্য তিলকের ন্যায় উগ্রপন্থী স্বাধীনতা-বাদীও ইহার কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। কিন্তু বিনায়ক-সঙ্ঘ সঙ্কল্পে অটল। বস্ত্র-যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিবার জন্য পুণায় দুইটি জনসভার অধিবেশন হইল। শেষ সভায় বিনায়ক বলিলেন, বস্ত্র-যজ্ঞের এই অনুষ্ঠান ভাবপ্রবণ হৃদয়ের সাময়িক উচ্ছ্বাস নয়—ইহার স্বার্থকতা আছে, এই সূক্ষ্ম-শিল্পের রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা নিরন্ন দেশবাসীর মুখের গ্রাস অপহরণ করিয়া বিদেশীর পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছি। তাই আজ স্বহস্তে ইহাকে দাহন করিয়া

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। বিদেশীর যে পাদুকা-চিহ্ন এতদিন গৌরবের রাজটীকা বলিয়া ললাটে বহন করিয়া আসিয়াছি, বহ্নিমান বস্ত্র-স্তূপের উজ্জ্বল আলোকে আজ দেখিতে পাইব, স্বেচ্ছাবৃত দাসত্বের উহা কি সুগভীর কলঙ্ক-লাঞ্ছনা! উপসংহারে বিনায়ক যখন উদাত্ত কণ্ঠে যজ্ঞসমিধ প্রার্থনা করিলেন, চতুর্দ্দিক হইতে বিচিত্র পরিচ্ছদের অজস্র বর্ষণে সভাক্ষেত্র সমাকীর্ণ হইয়া গেল। শকটপূর্ণ বস্ত্রস্তূপ শোভাযাত্রাসহকারে নগরপ্রান্তে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। ক্রমবর্দ্ধমান জনসঙ্ঘ এরূপ বিপুল আকার ধারণ করিল যে, উহা নিয়ন্ত্রিত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। লোকমান্য তিলক তখন পূর্ব্ব মতবৈষম্য বিস্মৃত হইয়া শোভাযাত্রা-পরিচালনে অবতীর্ণ হইলেন। এক উন্মুক্ত প্রান্তরে বস্ত্ররাশি স্তূপীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হইল। যাজ্ঞিকের আহুতি পাইয়া হোমানল জ্বলিয়া উঠিল। সে আলোকে বহুদূর উদ্ভাসিত হইল। বহ্ন্যুৎসবরত জনগণকে সম্বোধন করিয়া তিলকের কণ্ঠ বজ্র-নির্ঘোষে গর্জ্জিয়া উঠিল। পারঞ্জপে বস্ত্রস্তূপ হইতে একটি কোট তুলিয়া লইয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—কিরূপে উহারই কুক্ষি আশ্রয় করিয়া ভারতের রাজৈশ্বর্য্য ও রাজমুকুট সাগরপারে উপনীত হইয়াছে, এবং কিরূপে এখনও উহা পলে পলে তিল তিল করিয়া একটা বিরাট জাতির জীবন-শোণিত মোক্ষণ করিতেছে।

ভারতের ইহাই বস্ত্র-যজ্ঞের প্রথম অনুষ্ঠান, কাজেই জাতির প্রাণে ইহা এক নবীন উন্মাদনা আনিয়া দিল, এবং বর্জ্জন-আন্দোলনের স্রোতোবেগ উচ্ছ্বসিত প্রবাহে নূতন প্রণালী-পথে প্রবাহিত হইল। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ এই অভিনব অনুষ্ঠানের যশোগানে মুখর হইয়া উঠিল, কিন্তু অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাসমূহ উর্দ্ধস্বরে বীভৎস চীৎকারে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইল। সে আর্ত্তনাদে

কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ভীত না হইয়া পারিলেন না, তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টায় প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইলেন যে, এই কাণ্ডজ্ঞানহীন উন্মত্ততার সহিত তাঁহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। কিন্তু তাহা প্রমাণ করিবার পথে প্রধান অন্তরায় হইলেন সাভারকর; কারণ কলেজের ছাত্র হইয়াও, তিনিই ছিলেন বস্ত্র-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ও হোতা। কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিলেন, বিনায়ককে এরূপ কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে হইবে, যাহা দেখিয়া অনুগামী যুবকগণ তাঁহার আদর্শ অনুসরণে ভীত হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারের মন হইতে সন্দেহের ক্ষীণতম রেখাটুকুও অপনোদিত হইবে। বহু গবেষণার পর বিনায়ককে দশ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া ছাত্র-শ্রেণী হইতে তাঁহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইল, এবং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রাবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া চরমপত্র দেওয়া হইল। দেশীয় সংবাদপত্রসমূহ কর্ত্তৃপক্ষের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল, বিনায়কের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের প্রশংসা এবং কঠোর দণ্ডাদেশের প্রতিবাদকল্পে স্থানে স্থানে সভা-সমিতি হইতে লাগিল। প্রতি সভায় বিনায়কের অর্থদণ্ডের টাকার জন্য আবেদন জ্ঞাপন করা হইতে লাগিল। চাঁদাও উঠিতে লাগিল অজস্র, শেষে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনীয় টাকার অঙ্ক অতিক্রম করিয়া এত ঊর্দ্ধে উঠিল যে, বাধ্য হইয়া বিনায়ককে উদ্বৃত্ত টাকা একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করিতে হইলে। সৌভাগ্যবশত পুণার কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের ন্যায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের চক্ষে বিনায়কের দেশপ্রেম অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া প্রতীয়মান হইল না, কাজেই বি. এ. পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার জন্য বিনায়ক অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার আচরণে বরাবরই যাঁহারা বিরক্ত, অথচ তিরস্কার করিবার উপলক্ষ্যের অভাবে এতদিন নীরব ছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, এই সুবর্ণ সুযোগ। পরীক্ষা দিবার

অনুমতি পাইলে কি হয়, সারা বৎসর গলাবাজি করিয়া বেড়াইলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। তিনি অকৃতকার্য্য হবেনই, এবং সেই অকৃতকার্য্যতাকে উপলক্ষ্য করিয়া এতদিনের সঞ্চিত বিরাগ উদ্গীরণ করিয়া বুকের বোঝা লাঘব করিবেন। কিন্তু পরীক্ষা অন্তে যখন ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল, তাঁহাদের সকল জল্পনা-কল্পনা ব্যর্থ করিয়া বিনায়ক সসম্মানে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; কাজেই সুযোগান্বেষী শুভেচ্ছুদিগকে ওষ্ঠাগ্রে সঞ্চিত তিরস্কার পুনরায় গলাধঃকরণ করিতে হইল।

এখন আর পড়ার তাগিদ নাই, পরীক্ষার পিছুটান নাই, এখন তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত, কাজেই অনন্যচিত্ত হইয়া এইবার দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন। প্রথমেই তিনি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বিচ্ছিন্ন সমিতিগুলির শৃঙ্খলা-বিধানে মনোযোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রের প্রায় দুই শত প্রতিনিধি লইয়া একটি গোপন সভার অধিবেশন হইল। এখানে মনে রাখা দরকার যে, তখনও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-পথে পূর্ণস্বাধীনতা-অর্জ্জনের প্রকাশ্য কর্ম্মপন্থা ঘোষিত বা অনুসৃত হয় নাই। অনেক যুবকই বিপ্লবের গোপন পথ অথবা অরাজকতার পথ ভিন্ন অন্য পথ সেদিন ভাবিতে পারে নাই। পরে কিন্তু অনেক বিপ্লবী মত বদলাইয়াছে—প্রকাশ্য পথে অবতীর্ণ হইয়াছে। বিনায়ক একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দ্বারা সমিতির ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি ভালরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, কলেজে অধ্যয়ন-কালে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল, শুধু মহারাষ্ট্রের মধ্যেই বিপ্লব-আন্দোলন জাগাইয়া তোলা; কিন্তু এখন আদর্শ উচ্চতর ও কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ততর করিবার সময় আসিয়াছে। এখন আর শুধু মহারাষ্ট্র নয়, সমগ্র ভারতব্যাপী এই ভাবধারা বিস্তার করা হইবে। এই উদ্দেশ্য সার্থক করিয়া

তুলিবার জন্য মহারাষ্ট্রের বুকে বিক্ষিপ্ত সমিতিগুলিকে একীভূত করা হইল এবং সেই সম্মিলিত সমিতির নামকরণ হইল "অভিনব-ভারত"।

ইহার পর বিনায়ক মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণে বাহির হইলেন। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে সভা-সমিতি হইতে লাগিল। প্রতি সভায় তাঁহার স্বরচিত গীতিকাব্য "সিংহগড়" ও "বাজী দেশপাণ্ডে", এবং অভিনব-ভারতের অন্যতম কর্ম্মী গোবিন্দ-বিরচিত বিদ্রোহের গানগুলি গীত হইত। জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিবার পক্ষে একা বিনায়কের কণ্ঠই পর্য্যাপ্ত, তাহার উপর এই সকল অগ্নিগর্ভ সঙ্গীতগুলি দেশবাসীর চিত্তকে বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিষাক্ত করিয়া তুলিল। তখন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সরকার গীতি-পুস্তকগুলি বাজেয়াপ্ত করিলেন। দেশময় অনুসন্ধান ও খানাতল্লাসীর দ্বারা পুলিস বহু পুস্তিকা হস্তগত করিল। কিন্তু তাহার ফলেও গানগুলির প্রচার বন্ধ হইল না। হওয়া দূরে থাক, বাড়িয়াই চলিল। যাঁহারা তখন পর্য্যন্ত এই সব বইয়ের নাম শুনেন নাই, অথবা যাঁহারা নাম শুনিয়াছিলেন মাত্র—চোখে দেখেন নাই, সরকারের এই "বাজেয়াপ্ত" তাঁহাদেরও কৌতূহলী করিয়া তুলিল। ফলে, বিদ্রোহের গানগুলি কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া মহারাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। আজিও মহারাষ্ট্রে সে সঙ্গীত তেমনই শ্রুত হয়।

বিনায়ক স্থির করিলেন, অতঃপর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিবেন। ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে স্বাধীন দেশের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিয়া রাজনীতি-শিক্ষার সুযোগ লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা কয়েকটি বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন। বিনায়ক এই একটি বৃত্তি সম্বল করিয়া বিলাতে আইন-অধ্যয়ন করিতে যাইবার



সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুবক্তা এবং রাজনীতিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ইতিমধ্যেই দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাঁহার বৃত্তিলাভের যোগ্যতা সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন সন্দেহ ছিল না; তাহার উপর তিলক এবং পারঞ্জপে যখন সে দাবি সমর্থন করিয়া শ্যামজীর নিকট সুপারিশ করিলেন, তখন বৃত্তিলাভের পথে তাঁহার আর কোন অন্তরায় রহিল না।

বিনায়ক তাঁহার নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতা, অদ্ভুত সংগঠনশক্তি এবং অসাধারণ বাগ্মিতা গুণে ইতিপূর্ব্বেই সরকারের যথেষ্ট বিরাগ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার উপর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকালে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতাবলী এবং বিদেশী বস্ত্রদাহন-যজ্ঞের মৌলিক আবিষ্কার তাহাতে ইন্ধন যোগাইল। ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে অপসৃত করিবার জন্য সরকার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এমন সময় বিলাত হইতে সংবাদ আসিল, বিনায়ক শ্যামজী-প্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। সংবাদ শ্রবণে বিনায়কও যেমন আশ্বস্ত হইলেন, সরকারও তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন, দেখিলেন, আপদ যদি আপনা হইতেই বিদায় হয়, তবে কেন তাহাকে ধৃত এবং দণ্ডিত করিয়া অনর্থক দেশময় একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করা! সরকার ভাবিলেন, এই উদ্ধত যুবক একবার লণ্ডনে উপনীত হইলে ইংরেজের শৌর্য্য বীর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের সহিত তাহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অরুণোদয়ে অন্ধকারের অন্তর্দ্ধানের মত ভারত হইতে ইংরেজ-রাজ্য উচ্ছেদের উন্মাদ কল্পনা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া, আইন-ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ ও প্রতিপত্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাও যে এই নিঃশঙ্ক তরুণ কর্ম্মীর অপরিণামদর্শী ঔদ্ধত্য অনেক পরিমাণে সংযত করিবে, সে সম্বন্ধেও সরকারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই ধরনের কল্পনায় যখন সরকারী কর্ম্মচারীরা রত ছিলেন,

বিনায়ক কিন্তু তখন ইংলণ্ড-যাত্রার প্রাক্কালে অভিনব-ভারত-সভার এক গোপন অধিবেশনে সহকর্ম্মীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, আইন অধ্যয়ন তাঁহার বিলাত-গমনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হইলেও মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। তাঁহার লক্ষ্য হইতেছে, ভারতীয় বিপ্লবের বাণী সাগরপারে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া; এবং সভ্য জগতকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, ভারতবাসী স্বেচ্ছায় দাসত্ব-শৃঙ্খল বহন করে না, পরাধীনতার জ্বালায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সেও আজ বাঁধন ছিঁড়িতে চায়। শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার সামর্থ্য নির্ণয় করা যেমন আবশ্যক, তেমনই এক্ষেত্রেও লণ্ডনে উপস্থিত হইলে ইংরেজ রাজশক্তির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবে, এবং তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন, কোথায় তাহাদের শক্তির উৎস, এবং কোথায় তাহাদের দুর্ব্বলতা। রুশ তখন রাষ্ট্রবিপ্লবের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। স্বেচ্ছাচারী জার-শাসনতন্ত্রের অকথ্য অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া রাজভক্ত শান্তিপ্রিয় রুশ-প্রজা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, গৃহে গৃহে গোপন ষড়যন্ত্র এবং পথে পথে গুপ্তহত্যা। নররক্তে রুশিয়ার রাজপথ কর্দ্দমাক্ত। বিনায়কের ভাবপ্রবণ চিত্ত ভাবিয়া বসিল যে, রুশ-বিপ্লবীদের সহিত মিশিয়া আধুনিক উপায়ে বিপ্লব-আন্দোলন পরিচালন করিতে হইবে ও বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিখিয়া আসিবেন, এবং সেই বিজ্ঞান-সম্মত উপায় ও উপকরণের সাহায্যে ভারতীয় বিপ্লব-আন্দোলনকে পরিচালনা করিবেন।

এই সময় পুণায় অগম্যযোগীন নামে এক সাধুর আবির্ভাব হয়। সাধারণ সাধু হইতে ইনি একটু স্বতন্ত্র প্রকারের ছিলেন। সংসার-বিরাগী হইয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে পরকাল-সর্ব্বস্ব ছিলেন না। ইহকাল সম্বন্ধে যে শুধু চিন্তা-চর্চ্চা করিতেন তাহা নয়, স্বাধীনতা-আন্দোলনের

সমর্থনকল্পে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতেন। সেই সকল বক্তৃতার ভিতর দিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের যতটুকু আভাস পাওয়া যাইত, তাহা হইতে তাঁহাকে উগ্রপন্থী রাজনৈতিকদিগের পর্য্যায়ভুক্ত করিলে অবিচার করা হইত না। কোন একটি সভায় সন্ন্যাসী—যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী হইতে উপদেশ দেন, এবং বলেন যে, তাহারা যদি তাহাদের কোন প্রতিনিধিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা-লাভের এক অতি সহজ এবং সুগম পথ দেখাইয়া দিবেন। বিনায়ক এই সময়ে বোম্বাইয়ে ছিলেন, পুণার ছাত্রগণ তাঁহাকেই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া তারযোগে সমস্ত ব্যাপার জ্ঞাপন করিল। স্বাধীনতা-লাভের অভিনব পন্থার নির্দ্দেশ লইবার জন্য বিনায়কও অবিলম্বে সাধুজীর নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সাধুজী স্বাধীনতা ও সংগঠন সম্বন্ধে এমন কতকগুলি স্থূল মন্তব্য করিয়াই বক্তৃতার উপসংহার করিলেন, যাহা রাজনীতি-শিক্ষার প্রথম পাঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিনায়ক সবিনয়ে এই অপূর্ব্ব উপদেশামৃত পান করিয়া গৃহে ফিরিলেন, এবং সেইখানেই সেই ব্যঙ্গনাট্যের যবনিকা-পাত হইল। কিন্তু যে গোয়েন্দা প্রহরী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা বিনায়কের অনুসরণ করিত, সে এই সাধু-সাভারকর সম্মিলনের কথা যথাসাধ্য রঞ্জিত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিল। বহুদিন পরে যখন রাউলাট রিপোর্ট রচিত হয়, তখন দেখা গেল যে, সেই গোয়েন্দা-প্রদত্ত সংবাদ সম্বল করিয়াই বিনায়ক সম্বন্ধে সরকার তাহাতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, অগম্যযোগীন নামক এক সন্ন্যাসীর নিকটেই সাভারকর রাজনীতির প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহা যে সত্য নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে বিনায়ক বোম্বাই নগরীতে অভিনব-ভারতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন, এবং সমিতির রাজনৈতিক মতবাদ প্রচারকল্পে

'বিহারী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার অগ্নিগর্ভ রচনায় 'বিহারী' শীঘ্রই খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং দিনে দিনে তাহার প্রচার বাড়িয়া চলিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব-সমিতির সুব্যবস্থা বিধান করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মে অথবা জুন মাসে বিনায়ক বিলাত-যাত্রা করেন। যাত্রার পূর্ব্বে বন্ধু, শিষ্য এবং সহকর্ম্মীগণ নাসিক নগরীতে তাঁহাকে এক বিরাট সভায় বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, আইন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া চারি বৎসর পরে তাঁহাদের সখা, গুরু ও উপদেষ্টা আবার তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন। কিন্তু তখন তাঁহারা জানিতেন না যে, বিচ্ছেদ এবং মিলনের মাঝে নিগ্রহ-নির্ব্বাসন পূর্ণ বিংশ বৎসরের সুদীর্ঘ ব্যবধান! এই বিপ্লবী কর্ম্মীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পোষণ করার অপরাধে নাসিক নগরীকে পরবর্ত্তী-কালে কিন্তু অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা পোহাইতে হইয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রচারকার্য্য

ঊর্দ্ধে জোৎস্না-প্লাবিত নীলাকাশ, নিম্নে নিস্তরঙ্গ নীলসমুদ্র, যেন কৌমুদী-দর্পণে প্রতিফলিত তাহার প্রতিচ্ছবি। আপনার গতিবেগসৃষ্ট তরঙ্গশীর্ষে নৃত্য করিতে করিতে সিন্ধুপোত ছুটিয়া চলিয়াছে; আর আঘাত-ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বসিত জলস্রোত নিষ্ফল আক্রোশে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার পার্শ্বদেশ আহত করিতেছে।

রজনী গভীর, জাহাজের যাত্রীগণ সকলেই সুখসুপ্ত। শুধু বিনায়কের রূপপিপাসু কবি-প্রাণ তাঁহাকে কেবিনের কারাকক্ষ হইতে টানিয়া আনিয়া, নীরব নৈশ সৌন্দর্য্যের মাঝখানে নিঃসঙ্গ ছাড়িয়া দিয়াছে। অপলক চক্ষু বুঝি অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা, দৃষ্টি যেন সেখান হইতে

বিদায় লইয়াছে কোন সৌন্দর্য্যলোকের সন্ধানে। রজনীর মৌন মাধুরী কমনীয় করাঙ্গুলি-স্পর্শে মর্ম্ম-বীণায় যে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে, তাহারই একটি মধুর মূর্চ্ছনা রণিয়া উঠিতে চাহিতেছে কবিতা-ছন্দে; বিনায়ক সেই অনাগত অতিথির আগমনীর রাগিণী মৃদুকণ্ঠে আলাপ করিতেছেন। বিনায়ক বিপ্লবী হইলেও কবি। বজ্র-কঠোরের মধ্যে সরস-কোমল ভাবুকতা কেমন করিয়া মিশিল?

অদূরে ডেকের উপরে আর একটি যুবক দণ্ডায়মান। ইনি উত্তর-ভারতের কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, পিতৃহীন এবং মাতার একমাত্র পুত্র। বিনায়কের মত ইনিও বিলাত চলিয়াছেন আইন অধ্যয়ন করিতে। এই প্রবাসক্লেশ-অসহিষ্ণু তরুণ যুবকের চিত্ত সহজেই স্বজনবিরহে ব্যথাতুর, তাহাতে আবার প্রভুত্বপ্রয়াসী বিদেশী সহযাত্রী-গণের হৃদয়হীন উদ্ধত আচরণের রূঢ় আঘাতে তাঁহাকে এমন বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছিল যে, তিনি একরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী বন্দরে জাহাজ লাগিবামাত্র নামিয়া পড়িবেন, এবং ভারতগামী সর্ব্বপ্রথম জাহাজে দেশে ফিরিবেন। এই গভীর রাত্রিতে তিনিও ডেকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন আকর্ষণে। বিনায়ককে তদবস্থ দেখিয়া যুবকটি তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কথা-প্রসঙ্গে তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিলেন। বিনায়ক অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, দেশে ফিরিবেন কেন? কোন উত্তর না পাইয়া মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলেন, ব্যথাভরা সজল চক্ষু দুইটি সকল প্রশ্নের সমাধান লইয়া সম্মুখে ছলছল করিতেছে। স্বভাব-কঠোর পুরুষচিত্তে এই নারীসুলভ নমনীয়তা দর্শনে আহত হইয়া, ছায়াপথচারী কবি-প্রাণ মুহূর্ত্তমধ্যে ভাবলোক হইতে বাস্তবের বন্ধুর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। বিনায়ক বলিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য

পরিবর্ত্তন, কি শোচনীয় অধঃপতন! মাত্র দুই শতাব্দী পূর্ব্বেও যে জাতির মেয়েরা স্বহস্তে পোত চালনা ক'রে ভারত-মহাসাগর মথিত ক'রে বেড়াতেন, দুশো বছর যেতে না যেতে সে জাতির পুরুষগণ এমন ভীরু-স্বভাব, এমন দুর্ব্বলচিত্ত হয়ে পড়েছেন যে, সমুদ্র-যাত্রার নাম শুনলে তাঁরা এমন জলাতঙ্কগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠেন। এই দেখুন না, কত আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছেন, অথচ অনভ্যাস-হেতু একটু মাথা ঘুরেছে, কিংবা মায়ের জন্য একটু মন-কেমন করেছে, আর স্থির ক'রে ফেলেছেন, সকল আদর্শ ও উচ্চাভিলাষ সাগরজলে বিসর্জ্জন দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। জাতি হিসেবে ইংরেজদের সঙ্গে এইখানেই আমাদের স্বভাবগত পার্থক্য, এবং এই পার্থক্যের জন্যই সংখ্যায় লঘিষ্ঠ এবং সভ্যতায় শিশু হয়েও তারাই আজ প্রভু; এবং গণনায় বহুগুণ গরিষ্ঠ এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও আমরা তাদের পদানত। ক্লাইভ যখন ভারতে এসেছিল, তখন সেও ছিল আমাদের মত তরুণ যুবক; তা ছাড়া তখনকার দিনে পথ এমন সুগম ও সংক্ষিপ্ত ছিল না, পালের জাহাজ হালে ব'য়ে, ঝড়-তুফানের কৃপাপাত্র হয়ে দীর্ঘ ছয় মাসে বিলাত থেকে ভারতে আসতে হ'ত; এক বৎসর পূর্ব্বে আত্মীয়স্বজন নিরাপদে পৌঁছানোর সংবাদই পেতেন না। এ সমস্ত তুচ্ছ ক'রেও সে এসেছিল জননী এবং জন্মভূমির কোল ছেড়ে; শুধু এসেছিল নয়, যুদ্ধ ক'রে একটা প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গ'ড়ে তুলেছিল। আর আমরা বাষ্পীয় পোতের প্রথম শ্রেণীর যাত্রীরূপে সকল রকম সুখ-সুবিধার অধিকারী, আমাদের অভিভাবকগণ পূর্ব্ব হতেই গন্তব্য স্থানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের শত ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, সে সব সত্ত্বেও আমাদের এই শিশুর মত অসহায় বিহ্বলতা। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তফাত

কোথায় দেখুন। ক্লাইভের মত দুরন্ত ছেলে সাম্রাজ্য গড়ে, আর আমাদের মত শান্ত ছেলে সাম্রাজ্য খোয়ায়—দাসত্ব করে। না না, আপনার ফিরে যাওয়া কিছুতেই হতে পারে না। আপনি বলেছিলেন না যে, আপনার মায়ের কোন অভাব নেই! তিনি আপনার উপার্জ্জনের ভরসা করেন না; বিলাত পাঠাচ্ছেন কেবল মাত্র শিক্ষা দেবার জন্যে! জননীর অভাব না থাকতেও পারে। কিন্তু দীনা জন্মভূমির পানে একবার ফিরে চান,—ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী রাজরাজেশ্বরী আজ হৃতসর্ব্বস্বা পথের ভিখারিণী, তিনি আপনার কাছে অনেক কিছু আশা করেন। তিনি চান, তাঁর সন্তানগণ স্নেহাঞ্চলের স্নিগ্ধ ছায়াতল ছেড়ে ক্ষিপ্ত গ্রহের মত দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে চলুক শক্তির সন্ধানে। গৃহসুখের কথা ভেবে ব্যাকুল হচ্ছেন? দেশকে বাদ দিয়ে তো গৃহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না বন্ধু। যে দেশের বিরাট বুকে ক্ষুদ্র একটু স্থান জুড়ে গৃহের প্রতিষ্ঠা, সেই দেশ যখন পরবশ্যতায় নিপীড়িত, বিদেশী বণিকের লোলুপ লুণ্ঠনে সর্ব্বস্বান্ত, তখন কল্পনার কুসুম-শয্যায় শয়ন ক'রে গৃহসুখের স্বপ্ন দেখা কি সাজে? অন্য কোন কারণে না হোক, অন্তত দেশমাতৃকার মুখ চেয়েও আপনার বাড়ি ফিরে যাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে হবে। অর্থকরী বিদ্যা অর্জ্জনের যদি আবশ্যকতা না থাকে, তবু বিলাত যেতে হবে, সেখান থেকে ফ্রান্স এবং রাশিয়ায় ছুটতে হবে—ঐ সব দেশে কি ক'রে বিপ্লব সম্ভব হয়েছে তা শিক্ষা করবার জন্যে। অর্জ্জিত বিদ্যা দিয়ে যদি জননীর দুঃখ দূর করবার দরকার না থাকে, তবে জন্মভূমির দুর্গতিদূর-কল্পে তাকে নিয়োজিত করতে হবে।

বলা বাহুল্য, বিনায়কের এই দীর্ঘ বক্তৃতা বিফল হয় নাই, এবং যুবকটি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময় প্রবীণ দেশকর্ম্মী পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা লণ্ডনে ভারতীয়

হোমরুল-আন্দোলন পরিচালন করিতেছিলেন। এই আন্দোলনের উচ্চ মতবাদ তৎকালীন কংগ্রেসের, এবং শুধু কংগ্রেসের কেন, উৎকটতম চরমপন্থী রাজনীতিক দল 'ন্যাশনালিস্ট পার্টি'রও দুষ্পাচ্য ছিল। কিন্তু বিনায়কের লণ্ডন-গমনের এক বৎসরের মধ্যে প্রবাসী ভারতবাসীগণের রাজনৈতিক মুক্তির ধারণা এমন দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিল যে, "বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে হোমরুল-আন্দোলন" এই কথাটি তাঁহারা অর্থহীন বাক্য-সমষ্টিতে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিলেন। রাজনীতিক ধারণা-সম্পন্ন ভারতীয় যুবকদের সম্মুখে বিনায়কই সর্ব্বপ্রথম প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হইলেন যে, ভারতীয় জটিলতম সমস্যার সমাধান-কল্পে 'শান্তিপূর্ণ আইনানুগত' আন্দোলন নিরর্থক। তিনি 'স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ' নামে লণ্ডনে এক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশনে ভারতীয়-মাত্রেরই প্রবেশাধিকার ছিল। এই সঙ্ঘের অধিবেশনে সাভারকর ফরাসী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া যখন তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় প্রমাণ করিতেন যে, 'বিপ্লব' এবং 'শান্তিপূর্ণ' এই দুইটি কথার একত্র সমাবেশ আলো এবং অন্ধকারের একত্র সমাবেশের ন্যায়ই অসম্ভব ও অপ্রাকৃত ব্যাপার, তখন অন্তত সেই সময়টুকুর জন্যও তাঁহারই হইত জয়, তাঁহার একান্ত বিরুদ্ধবাদীর সকল তর্ক-যুক্তি বিনা প্রতিবাদে বিনায়কের নিকট আত্মসমর্পণ করিত। দেখিতে দেখিতে ভাবপ্রবণ যুবকচিত্তগুলি বিনায়কের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। ইহার ভাবী ফল বা অপর পথের কথা কেহ ভাবিবার অবসরও পাইল না।

এই ভাবপ্রবণ যুবকদলের মধ্যে যাঁহাদিগকে বিশ্বাসযোগ্য এবং কর্ম্মক্ষম বলিয়া মনে হইল, তাঁহাদিগকে 'অভিনব-ভারতে'র অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে গ্রহণ করিয়া লওয়া হইল। এইরূপে অনতিকালমধ্যে কেম্ব্রিজ,

অক্সফোর্ড, এডিন্‌বার্গ এবং ম্যাঞ্চেস্টার প্রভৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের ভারতীয় ছাত্রগণ সাভারকরের 'অগ্নিমন্ত্রে' দীক্ষিত হইয়া পড়িল।

যুবকের আহ্বানে যুবক সাড়া দিবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই, বিস্ময়ের বিষয় ইহাই যে, এই তরুণ বিপ্লবীর ভাবপ্রবণ সংস্পর্শে আসিয়া বৃদ্ধ এবং বিচক্ষণ রাজনীতিক কৃষ্ণবর্ম্মারও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। তিনিও তাঁহার মত-পরিবর্ত্তনের হেতুবাদ দর্শাইয়া পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ্যে বিপ্লবীদলভুক্ত হইলেন, এবং হোমরুল-আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া লণ্ডন হইতে প্যারিস চলিয়া গেলেন। ভারতীয় জন-নায়কদের মধ্যে তিনিই প্রথম পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি উপস্থাপিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, যেহেতু পূর্ণ-স্বাধীনতাই জাতির চরম লক্ষ্য এবং ইহা না পাইলে সে কোন দিনই পরিতুষ্ট হইতে পারিবে না, তখন বাহুবল সম্বল করিয়াই শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া জাতির আর গত্যন্তর নাই। তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের সকল ভার বিনায়কের হস্তে তুলিয়া দিলেন, এবং অভিনব-ভারতের এই তরুণ নায়কের প্রতি যে শুধু আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন তাহা নয়, তাঁহার প্রতি বাৎসল্যে এবং শ্রদ্ধায় পণ্ডিতজীর বুক ভরিয়া উঠিল। এই ব্যাপারে বিলাতী সংবাদপত্রসমূহ সাভারকরকে শ্যামজীর সহকারীরূপে কীর্ত্তিত করিয়া উচ্চ চীৎকার শুরু করিয়া দিল। এই মন্তব্যে আহত হইয়া বিনায়কের গুণমুগ্ধ সহকর্ম্মীগণের মধ্যে কেহ যদি কোন দিন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিতেন, তাহা কেন হইবে? আপনিই এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক, এই সঙ্ঘের স্রষ্টা, পণ্ডিতজী তো আপনারই নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিয়া সম্প্রতি সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন মাত্র, বিপ্লব-প্রচেষ্টার কার্য্যে আজ পর্য্যন্ত তিনি প্রত্যক্ষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, তথাপি তিনিই নেতৃত্বের গৌরব লাভ করিবেন, আর আপনি তাঁহার

সহকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, ইহা কি যুক্তিসঙ্গত? বিনায়ক তাহার উত্তরে বলিতেন, পণ্ডিতজী কার্য্যত বিপ্লব-সমিতির কোন সেবা করেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজনমান্য দেশনায়কের প্রকাশ্যে বিপ্লব-পন্থা অনুমোদন করাটাই কি একটা বড় কাজ নয়? ভারতে বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্ভবপর করিয়া তোলা সম্বন্ধে এই দুই অসমবয়স্ক সহ-কর্ম্মীর মধ্যে যেসব কথোপকথন হইত, সে সকল যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার সময় যেমন এখনও আসে নাই, তেমনই ইংলণ্ডে অভিনব-ভারতের বহুমুখী কর্ম্মতৎপরতার বিস্তৃত বর্ণনও এখন কার্য্যত অসম্ভব।

ক্রমশ এই সমিতির নাম ও প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যে সকল ভারতীয় ছাত্র সমিতির বিশিষ্ট সভ্যরূপে পরিগণিত হন, তাঁহাদের মধ্যে লালা হরদয়াল, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর সহোদর শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় এবং মাদ্রাজের সর্ব্বজনবিদিত নেতা ভি. ভি. এস. আয়ার অন্যতম। লালা হরদয়াল ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় ও সরকার প্রদত্ত দুইটি পৃথক বৃত্তি লাভ করিয়া সিভিল-সার্ভিস পড়িবার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, কিন্তু শুভ বা অশুভ ক্ষণে অভিনব-ভারতের সংস্পর্শে আসিয়া দুইটি বৃত্তিই প্রত্যাখ্যান করিয়া বিপ্লব-সমিতির কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কখনও বা গদর দলের সহিত যোগ দিয়া, আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে বৈপ্লবিক কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিতেন, আবার কখনও ইউরোপীয় মহা-যুদ্ধের সুবর্ণ সুযোগে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তুরস্ক ও জার্মানির অভিজাতবর্গকে সচেষ্ট করিবার প্রয়াসে লিপ্ত থাকিতেন। যে দেশের সেবার ভাবে অনুপ্রাণিত হরদয়াল তাঁহার ভাবী জীবনের সুখ-সমৃদ্ধির সকল আশা বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, সেই প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমির ধূলিকণা তাঁহার নিকট আজ

পারিজাত-পরাগের মতই কল্পনার সামগ্রী। তদবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি সেই জন্মভূমির স্নেহক্রোড় হইতে বঞ্চিত হইয়া চিরপ্রবাসীর জীবন যাপন করিতেছেন। এই সকল কৃতী শিক্ষিত যুবকের আত্মদান অভিনব-ভারতকে যে শক্তিতে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারত-সরকারকে বহু বৎসর ধরিয়া সেই সজ্ঘ-শক্তির সহিত অশ্রান্ত সংগ্রামে নিয়োজিত রহিতে হইয়াছিল। সরকারী রিপোর্টে তাহার পরিচয় আছে।

ক্রীড়াচ্ছলে বালকগণ লোষ্ট্রনিক্ষেপে শান্ত সরসীর বক্ষ চঞ্চল করিয়া তুলে, এবং সে চাঞ্চল্য যদিও সঞ্চারিত হয় প্রথমে আহত স্থানটুকুর সঙ্কীর্ণ বুকেই, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহা ক্রমবর্দ্ধমান বৃত্তের আকারে সরসীর সমস্ত বুকখানি উদ্বেল করিয়া তুলে। ভারত-সরকার তেমনই ক্ষমতার মোহে মুগ্ধ হইয়া, বুঝি লীলাচ্ছলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই আঘাত বাংলার জাতীয় জীবনের শান্ত সাগরে যে আলোড়ন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা বঙ্গ-ভঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভূত হইলেও ইতিমধ্যে জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করিবার উদ্দেশ্যেই যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়, ভারতীয় বিপ্লবীগণ কিন্তু তাহাকেই দেশের কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যে, দেশের রাষ্ট্র-মুক্তি সাধনের সাহায্যে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সেই প্রচেষ্টায় পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়, এবং সর্দ্দার অজিত সিং নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দণ্ডাদেশের সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছিলে অমনই তত্রত্য বিপ্লবীগণ তাহাকে রাজনীতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার সুযোগ পাইলেন এবং সে সুযোগ ছাড়িলেন না। তাঁহারা বক্তৃতা ও লেখনী সাহায্যে এই কথাই প্রচার করিতে লাগিলেন যে, যে দেশের অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার লাভের বৈধ আন্দোলন রাজশক্তি এইরূপ নিষ্ঠুর হস্তে দমন করে, সে দেশের সন্তানদের স্থূলতম নাগরিক অধিকারও যে কোন মুহূর্ত্তে শাসন-শক্তির

পদদলিত হইতে পারে, সে দেশে কেবলমাত্র বচনচাতুর্য্য এবং আবেদন-নিবেদন দ্বারা স্বাধীনতা লাভের প্রয়াস জ্ঞানকৃত আত্মবঞ্চনা মাত্র। বিপ্লবীদলের এই সকল যুক্তি লোকচিত্তে প্রভাব বিস্তার করিল এবং প্রশ্ন উঠিল—কঃ পন্থা? উত্তর হইল— যে পন্থা সুবিস্তার রহিয়াছে সম্মুখে ছায়াপথের মত, সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, রক্ত-কর্দ্দমাক্ত। এই পন্থার নাম শুনিয়া অনেকেই মাথা নাড়িলেন; কিন্তু ভাবপ্রবণ যুবক-চিত্ত সায় দিয়া বসিল। এ গোপন ও সন্দিগ্ধ পথেই তাহারা পা দিল। অভিনব-ভারতের এক বিশিষ্ট কর্ম্মী, যিনি ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করিতে গিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এবং পরে কারামুক্ত হইয়া বিলাতে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন, এক সভায় উঠিয়া বলিলেন যে, যদি অর্থ-সাহায্য পান, তাহা হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মোহ হইতে মুক্ত হইয়া এবং ভাবী সাংসারিক উন্নতির সকল সম্ভাবনা পরিহার করিয়া তিনি রাশিয়ায় যাইতে প্রস্তুত, এবং সেখানে গিয়া বিস্ফোরক দ্রব্যপ্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিয়া প্রপীড়িত রুশ-প্রজা যে উপায়ে স্বেচ্ছাচারী জার-সরকারের সম্মুখীন হইয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে ভারত-সরকারের সহিত একবার শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে তিনি কৃতসঙ্কল্প। রুশিয়ার সঙ্গে ভারতের তফাতের কথা কেই বা তোলে, ভাবপাগল সমিতির সভ্যগণ সোল্লাসে তাঁহার এই স্বতঃপ্রবৃত্ত 'আত্মদান' বরণ করিয়া লইলেন। চাঁদা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং সেই সপ্তাহেই বিপ্লবী মারাঠী—একজন বাঙালী এবং একজন মাদ্রাজী সহকর্ম্মী সহ, বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ রুশ বিপ্লবীর অনুসন্ধানে লণ্ডন ছাড়িয়া প্যারিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এই ঘটনার পূর্ব্বেই কিন্তু ভারতে বোমা প্রস্তুতের পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল, এবং এই দারুণ দুঃসাহসিকতার কার্য্যে আগুন

লইয়া খেলা করিতে গিয়া অনভিজ্ঞ ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে সময়ে সময়ে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত। কখনও কখনও বোমা ফাটিয়া গিয়া নির্ম্মাতাগণ মারাত্মকরূপে আহত হইতেন। এদিকে প্যারিসেও অনেক অর্থলিপ্সু জাল বিপ্লবী এই সকল অনভিজ্ঞ যুবকদের ভুল প্রণালী শিখাইয়া দিয়া বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতে লাগিল। ভারতীয় বিপ্লবীগণ অজস্র অর্থব্যয় এবং শক্তি ও সামর্থ্য ক্ষয় করিয়াও সঠিক প্রণালীর সন্ধান করিতে পারিলেন না, তখন হতাশ হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সত্য সত্যই এক প্রকৃত বিপ্লবীর সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি একজন ফেরারী রুশ বিদ্রোহী। ইনিই বোমা প্রস্তুত ও বিপ্লব পরিচালনে বোমার প্রয়োগ-প্রণালী ও কার্য্যকারিতা ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং তাহা ছাড়া বিস্ফোরণ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত একখানি পঞ্চাশ-পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তিকাও বিনামূল্যে উপহার দিলেন। অভিনব-ভারত-সমিতির উদ্যোগে এই পুস্তিকার বহু খণ্ড সাইক্লোস্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইল। পরবর্ত্তী-কালে কলিকাতা মানিকতলা, এলাহাবাদ, লাহোর, নাসিক প্রভৃতি স্থানে খানাতল্লাসীর ফলে পুলিস এই পুস্তিকার বহু খণ্ড হস্তগত করে।

'অভিনব-ভারতে'র সভ্যগণ ইংলণ্ডেই তাঁহাদের নবনির্ম্মিত বোমার প্রথম প্রয়োগ করিতে উৎসুক হইয়া উঠিলেন, কিন্তু সাভারকর তাঁহাদিগকে এই যুক্তি দেখাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করিলেন যে, ওরূপ করিলে তাঁহাদের গোপন অস্তিত্ব পুলিসের চক্ষে প্রকট হইয়া পড়িবে, এবং ফলে বিস্ফোরণ-বিদ্যা তাঁহাদের সহিত ইংলণ্ডেই বিলোপ প্রাপ্ত হইবে—ভারতে কোন দিনই প্রবর্ত্তিত হইবে না। কাজেই স্থির হইল, তাঁহাদের মধ্যে তিন-চারিজন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইবেন, এবং অত্রত্য বিপ্লব-সম্প্রদায় এই বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত হইলে, দেশব্যাপী বহ্ন্যুৎসবের বিপুল

আয়োজন আরম্ভ হইবে। তদনুসারে কয়েকজন ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় পৌছিয়াই স্বকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সহসা একদিন বাংলায় মিঃ কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। সরকার সন্ত্রস্তবিস্ময়ে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে এই অভিনব বস্তুটির আকস্মিক আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেন।

এদিকে ইংলণ্ডপ্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীগণ অসমসাহসিক একটা কিছু করিবার আগ্রহে এমন পাগল হইয়া উঠিলেন, মরণ-নেশায় এমন মাতাল হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাদিগকে আর অধিক দিন সংযত রাখা নেতাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে 'ইণ্ডিয়া হাউসে'র কর্ম্মতৎপরতা বহু বিভাগে আত্মপ্রকাশ করিয়াও তৃপ্তি মানিতেছিল না। সাপ্তাহিক সাধারণ সভা ও দৈনিক বিতর্ক-সভার অধিবেশন, অশ্রান্ত লেখনী-সঞ্চালন, সহস্র সহস্র বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রণয়ন, মুদ্রণ ও ভারতে প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্যে সমিতির সভ্যগণের নিরলস হস্ত নিত্য নিয়োজিত থাকিত। এই সকল বিবিধ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াও সাভারকর কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির সুযোগ করিয়া লইতেন। এই কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেই তিনি বিপুলকায় দুইটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ম্যাৎসিনীর গ্রন্থাবলী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া নাসিকে মুদ্রিত করিয়া লন। মহারাষ্ট্রীয় জনসাধারণের মধ্যে এই বইখানির যত বহুল-প্রচার হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন মারাঠী পুস্তকের সেরূপ হয় নাই। তৎকালীন বিশিষ্ট সাময়িক-পত্রসমূহের স্তম্ভে ইহার অতি প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশিত হইতে লাগিল, এবং সর্ব্বশেষে সরকার এই পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন।

তাঁহার প্রথম পুস্তকের প্রশংসা মহারাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ '*The War of Independence*' বা ১৮৫৭

খ্রীষ্টাব্দের স্বাধীনতার যুদ্ধ সমগ্র ভারত, এমন কি ইংলণ্ডেও, সমাদর লাভ করিয়াছিল, এই গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য ছিল—বৈদেশিক শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ রহিয়াও একটা মুক্তিকামী জাতি কিরূপে দেশব্যাপী সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভবপর করিতে পারে, জনসাধারণের সম্মুখে তাহাই প্রকাশ করা। সাভারকরের লেখনীর শক্তি সরকারের অবিদিত ছিল না, তাই গ্রন্থটি সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাজেয়াপ্ত হইল। কোন পুস্তকের রচনা শেষ হইবার পূর্ব্বে তাহা বাজেয়াপ্ত হওয়া অভিনব ব্যাপার, তাই, এমন কি ইংরেজ-পরিচালিত পত্রিকাগুলিতেও সরকারের এই অতি-সতর্ক দুর্ব্বলতার তীব্র প্রতিবাদ হইতে লাগিল।

কিন্তু সরকারের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও বইখানি প্রকাশিত হইল এবং সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও শত শত খণ্ড ভারতে প্রবেশ লাভ করিল। পুস্তকে শিপাহী-বিদ্রোহকে সাভারকর স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ জাতির মস্তকে সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের পঞ্চাশৎ স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক উৎসবের অনুষ্ঠান করিবার খেয়াল গজায়। বিদ্রোহী সিপাহীগণের উদ্দেশ্যে অতি জঘন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বর্ষণ করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করিবার যথেষ্ট আয়োজন হইল। সাভারকর এই অনুষ্ঠানের প্রতিবাদকল্পে নানা সাহেব, ঝান্সির রাণী, তাঁতিয়া টোপী, কুমারসিং এবং মৌলবী আহম্মদ সাহেব প্রভৃতি পরলোকগত বিদ্রোহ-নায়ক-নায়িকাগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। এই উৎসবের সমর্থনে বিনায়ক যদিও বিশিষ্ট ভারতবাসীগণের মধ্যে একজনেরও সাহায্য বা সম্মতি লাভ করিলেন না, তথাপি তিনি পূর্ণ উদ্যমে তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন; কেন

না, যুব-শক্তি তাঁহার পশ্চাতে ছিল। ইণ্ডিয়া-হাউসে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হইল, ব্রত উপবাস ইত্যাদি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইল না। অসংখ্য বিপ্লবাত্মক পুস্তিকাও মুদ্রিত হইয়া ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে বিতরিত হইল। ভারতীয় ছাত্রগণ পাল্টা হিসাবে "সাধু স্বাধীনতা যুদ্ধের শহিদগণ" শীর্ষক শ্রদ্ধা-নিদর্শন বক্ষে ধারণ করিয়া কলেজে উপস্থিত হইলেন। কোন এক কলেজের একজন অধ্যাপক এই মান-চিহ্ন দেখিয়া দুঃসহ ক্রোধে সংযম হারাইলেন, এবং বলিলেন, "শহিদ! শহিদ কারা? নরহন্তাদিগের প্রতি শহিদের প্রাপ্য সম্মান?" স্বদেশীয় পরলোকগত যোদ্ধাদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য শ্রবণে ভারতীয় ছাত্রগণ তাহার প্রতিবাদকল্পে একযোগে কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ফলে, কেহ বা স্বেচ্ছায় সরকারী বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন, কেহ বা কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন, আবার অনেকে অভিভাবকের আহ্বানে বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাগমন করিতে 'বাধ্য হইলেন'। কিন্তু সাভারকরের পরিকল্পিত এই উৎসব-অনুষ্ঠান ব্যর্থ হইল না। ইহা কি দেশীয়, কি বিদেশীয় উভয় সমাজের মধ্যেই অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; বিলাতী সংবাদ-পত্রসমূহ অভিনব-ভারতের বহুমুখী বৈপ্লবিক কর্ম্মতৎপরতার প্রতিবাদে পূর্ণ হইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'টাইম্‌স'ও এই সকল কার্য্যকলাপের সহিত সাভারকরের নাম প্রকাশ্যভাবে জড়িত করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধে নিন্দা করিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ দলে দলে সাভারকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সঙ্গত অসঙ্গত অসংখ্য প্রশ্নে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন একদিন কোন এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধি সাভারকরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, দাসী তাঁহাকে বৈঠকখানা-ঘরে

লইয়া গেল। বিনায়ক সেই ঘরে অধ্যয়ন-মগ্ন ছিলেন। দাসী যাইতে উদ্যত হইলে সাহেব প্রশ্ন করিলেন, সাভারকর কোথায়? পরিচারিকা বিনীতভাবে বলিল, ঐ যে ওখানে যিনি ব'সে আছেন, উনিই সাভারকর। প্রতিনিধি মহাশয় একবার মাত্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সাভারকরকে দেখিয়া লইলেন, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইল না যে, সেই ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন তরুণ যুবকটিই বিশ্বত্রাস ভারতীয় বিপ্লবী সাভারকর। পরিচারিকা তাঁহার সহিত পরিহাস করিয়াছে মনে করিয়া সাহেব মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময়ে সাভারকর কক্ষের মধ্যে অপরিচিত ব্যক্তির আবির্ভাবে চকিত হইয়া সবিস্ময়ে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইতে অগ্রসর হইলেন। আগন্তুক ভদ্রলোকটি অতিশয় কুণ্ঠিতভাবে প্রশ্ন করিলেন, আপনিই কি মিঃ সাভারকর? বিনায়ক সহাস্যে উত্তর করিলেন, হ্যাঁ, আমিই। সাহেব বলিলেন, সত্য কথা বলতে কি, মিঃ সাভারকর, আপনার নাম শুনে অবধি আপনার বয়স, আকার ও আয়তন সম্বন্ধে আমাদের খুব উচ্চ ধারণা ছিল, কিন্তু—। কথা শেষ না হইতেই সাভারকর বলিলেন, কিন্তু আমাকে চাক্ষুষ দেখে খুব অপ্রতিভ হয়েছেন, এই না? কি করব বলুন? আমি যে আপনাদের আশানুরূপ হয়ে উঠতে পারি নি, তার জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আশা করি আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন, এবং আপনাদের লেখনীর লক্ষ্য যে একজন অজাতশ্মশ্রু তরুণ যুবক এই কথা মনে ক'রে আমার বিরোধিতা হতে নিরস্ত হবেন। প্রতিনিধি মহাশয় অবশ্যই সাভারকরের সে অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, ব্যক্তিগতভাবে বিনায়ক তাঁহাদের লক্ষ্য নহেন, তবে ভারতের সব-কিছুকে বিশ্বের চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করা ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। সাভারকর বিদেশীদের এই প্রচেষ্টা পণ্ড করিবার জন্য ভারাখিত

আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়া ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং জার্মান, চীন, রুশ ও ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিতেন। তাই এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন যদি সভ্য-জগতের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আকর্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে তাহা অভিনব-ভারত তথা সাভারকরের প্রচারকার্য্যের ফলেই হইয়াছে। তাহা ছাড়া, ইংরেজ-শাসনে অসন্তুষ্ট ব্রিটিশ-বিরোধী আয়র্লণ্ড, চীন, মিশর এবং তুর্কী প্রভৃতি জাতির বিপ্লব-নেতাদিগের সহিত সহযোগিতায় এককালে একটি বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের আয়োজন করার পরিকল্পনাও বিনায়কের মাথায় আসিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে লণ্ডনে মিঃ কার্জ্জন উইলির হত্যাকাণ্ড, এবং তৎসম্পর্কে ধিংড়ার বিচার বিবৃতি ও প্রাণদণ্ড, মার্সেলিস হইতে সাভারকরের পলায়ন প্রভৃতি ঘটনা সভ্য-জগতের দৃষ্টি ভারতীয় বিপ্লবীদের দিকে আকৃষ্ট করিল। ইহার পর ক্রমশ অন্যান্য জাতির বিপ্লব-নেতাগণ ভারতীয় বিপ্লব-নায়কগণের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সখ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপে পণ্ডিত শ্যামজী, ম্যাডাম ক্যামা, লালা হরদয়াল, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়, এবং অভিনব-ভারতের অন্যান্য অখ্যাত অজ্ঞাত অনেক সভ্য ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন কেন্দ্রে থাকিয়া এরূপ প্রবলবেগে প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকেন যে, গত ইউরোপীয় মহাসমরের সন্ধিপত্রে জার্মান-সম্রাট কাইজার ভারতের রাষ্ট্রগত পূর্ণ স্বাধীনতাকে বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি অপরিহার্য্য শর্ত্তরূপে উপস্থিত করিতে বাধ্য হন। সে সমস্ত কথাই সরকারী রিপোর্টে স্থান পাইয়াছে।

এ

সহি

ঝটিকার পূর্ব্বাভাষ

অভিনব-ভারতের কর্ম্মতৎপরতা দমন করিবার জন্য স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগ যখন ফ্রান্স জার্মানি প্রভৃতি স্থানে নব নব শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া ক্রমপরিসর কর্ম্মক্ষেত্র রচনায় বিব্রত, ভারতীয় বিপ্লবীগণও তখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কার, বাংলার উচ্চ পুলিস-কর্ম্মচারী ও ষড়যন্ত্র-মামলার রাজসাক্ষীগণের ধারাবাহিক হত্যা, লোকমান্য তিলক, পারঞ্জপে প্রভৃতি অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় নেতৃবর্গের গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসন-জনিত বোম্বাইয়ের ব্রিটিশ-বিরোধী হাঙ্গামা প্রভৃতি অভাবনীয় ব্যাপারে ভারত-সরকার উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এদিকে, সরকারের প্রাণপণ চেষ্টা ও সতর্কতা সত্ত্বেও অভিনব-ভারতের উদ্যোগে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম্, 'তলোয়ার' প্রভৃতি বৈপ্লবিক পত্রিকাসমূহের ভারত-প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইল না। সেই সব অগ্নিগর্ভ বিপ্লব-সাহিত্য ভারতীয় স্কুল, কলেজ, ছাত্রাবাস ও সমিতিসমূহে বিতরিত ও পঠিত হইয়া ভাবপ্রবণ ভারতীয়দের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ-সম্ভাবনার আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহা ছাড়া, শিখ জাতিকে বিপ্লব-সংঘটনে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য বিনায়ক শিখ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত কতকগুলি উন্মাদনাপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন, এবং অভিনব-ভারতের ভারতীয় কর্ম্মীগণ সেগুলি গুরুমুখী ভাষায় অনুবাদ করিয়া শিখ সৈন্যদলের মধ্যে গোপনে বিতরণ করেন।

শিখ সম্প্রদায়ের উপর বিনায়কের আস্থা ছিল প্রগাঢ়, তাই জাতীয় আন্দোলনের আবর্ত্তের মধ্যে শিখদিগকে টানিয়া লইবার আগ্রহ তাঁহার বরাবরই ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত

বৃত্তান্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। একদিন তিনি অভিনব-ভারতের এক বিশিষ্ট শিখ সহকর্ম্মীর সহিত শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লব-প্রচারকার্য্য চালাইবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় শিখ ভদ্রলোকটি বলিলেন, দেখুন, শিখ জাতির চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, তাই এই অসাধ্য-সাধনে আপনি উদ্যত হয়েছেন। শতাব্দী-ব্যাপী সরকারী প্রচারকার্য্যের ফলে ব্রিটিশ-শাসনের ওপর তাদের এমন অন্ধ অনুরাগ জন্মেছে যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে তারা নেমকহারামি করতে কিছুতেই রাজি হবে না। উত্তর শুনিয়া বিনায়ক বলিলেন, কিন্তু আপনিও শিখ, এই কিছুদিন পূর্ব্বেও তো আপনি সম্প্রদায় ছাড়া জাতীয় অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না; কিন্তু সহসা কি ক'রে, কোন্ ঘটনার আকস্মিক আঘাতে, আপনার ধমনীর সুপ্ত হিন্দু-শোণিত জাগ্রত হয়ে, সম্প্রদায়গত সঙ্কীর্ণ মতবাদ প্লাবিত নিমজ্জিত ক'রে আপনাকে দেশের মুক্তি-সাধনায় উন্মাদ ক'রে তুলেছে? তেমনই যদি মাত্র চার পাঁচ বৎসর আমার এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাবে প্রচারকার্য্য চালাতে পারেন, তা হ'লে আমি নিশ্চিত বলতে পারি, গুরু গোবিন্দসিংহের শোণিত তাদের শিরায় শিরায় নেচে উঠবে, এবং সাম্রাজ্য-শাসনে যারা আজ সরকারের সশস্ত্র দক্ষিণ-হস্ত, কিছুদিনের মধ্যেই তারা তার প্রবলতম শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই বিনায়ক গুরুমুখী ভাষায় লিখিত সহস্র সহস্র পত্রিকা ভারতে প্রেরণ করেন এবং শিখ সৈনিকগণের মধ্যে বিতরণ করেন বলিয়া প্রকাশ। এদিকে গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মতিথি উপলক্ষ্যেও লণ্ডনে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হইল, এবং স্মৃতিবাসরে লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ স্বর্গগত বীর কবি এবং ধর্ম্মগুরুর বিচিত্র কর্ম্মময় জীবনের আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। শিখ জাতির

ধর্ম্মমত, সঙ্ঘ ও সামরিক শক্তির সম্বন্ধে হিন্দুদিগকে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিবার জন্য বিনায়ক মারাঠী ভাষায় শিখ জাতির একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেন, কিন্তু গ্রন্থখানি ভারতে আসিবার পথে সেই যে সরকারী ডাক-বাক্সের উদরস্থ হইল, আজ পর্য্যন্ত সে নির্গমনের পথ খুঁজিয়া পাইল না।

বিনায়কের বিশ্বাস ছিল যে, ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারা মোড় ফিরিয়া বৈপ্লবিক প্রণালী-পথে প্রবাহিত হইবেই, এবং শিখ সম্প্রদায় সে প্রবাহের কূলে দাঁড়াইয়া লহরী গণনা করিবে না। অভিনব-ভারতের কর্ম্মতৎপরতা যদিও প্রথম প্রথম ভারতীয় শিখগণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, তথাপি সমিতির উদ্যোগে আমেরিকা হইতে প্রকাশিত 'গদর' পত্রিকা এবং অন্যান্য বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রবাসী শিখদিগের চিত্ত উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, কানাডার 'এমিগ্রণ্ট' আন্দোলন তাহাতে স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করিল, এবং 'কোমাগাটা মারু'র রোমাঞ্চকর ঘটনা সেই ধূমায়িত বিদ্রোহানল ফুৎকারে জ্বালাইয়া তুলিল। ইহার পর হইতে গদর-দলভুক্ত প্রবাসী শিখগণ পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে (অবশ্য বহু ভুল ও অতিরঞ্জিত সংবাদ পাইয়া) দলে দলে ভারতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান এবং তৎসহ গদর দলের উদ্যোগে লাহোর ও বর্ম্মায় বিপ্লব-প্রচেষ্টার ফলে বহু শিখ বিপ্লবী নির্ব্বাসিত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

বিনায়ক ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় অভিনব-ভারত-সমিতির সকল ভার তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর হস্তে ন্যস্ত করিয়া আসেন, এই সব প্রতিনিধির পরিচালনায় সমিতি এত দ্রুত এরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, ভারত-সরকার তাহা আর ব্যাপকতর হইবার সুযোগ না দিয়া তখনই শ্বাসরোধ করিয়া মারিবার জন্য তৎপর

হইলেন। সরকারের সন্দেহ হইল যে, সাভারকরই লণ্ডন হইতে অভিনব-ভারতকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও বিপ্লবাত্মক পুস্তিকাদি নিয়মিত-রূপে সরবরাহ করিয়া থাকেন, এবং সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়াই বোম্বাই ও নাসিকের হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে বিনায়কের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশপন্তকে দুইবার গ্রেপ্তার করা হয়। শ্বেতাঙ্গ ও সরকারী কর্ম্মচারীগণের প্রতি নাসিকবাসীর ক্রমবর্দ্ধনশীল অবজ্ঞা ও অবহেলার ভাব দেখিয়া, তাহাদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্যে নাসিক নগরীর পথে পথে সশস্ত্র ব্রিটিশ সেনাদলের সদম্ভ কুচকাওয়াজ শুরু হইল। কিন্তু তাহাতেও ফল হইল না। নাসিকবাসী সৈনিকদলের আবির্ভাবে ভীত না হইয়া আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং মহারাষ্ট্রের লোক সকল স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মীকী জয় রবে নাসিক নগরী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের ফলে বোম্বাইয়ে যে ব্রিটিশ-বিরোধী হাঙ্গামা হয়, সরকার সন্দেহ করেন যে, তাহা অভিনব-ভারতের কয়েকজন কর্ম্মীর প্ররোচনা ও প্রচেষ্টায় সংঘটিত হইয়াছিল। অভিনব-ভারতের গোয়ালিয়রস্থ শাখার কয়েকজন কর্ম্মী অস্ত্রশস্ত্রসহ ধৃত হন, এবং সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এইরূপে সরকার যখন দেখিলেন যে, তিলক ও পারঞ্জপে ধৃত হওয়াতেও স্বাধীনতা-আন্দোলন দমিত না হইয়া, দিন দিন গভীরতর ও প্রবলতর হইয়া চলিল, এবং আন্দোলনের পরিচালন-ভার বৈধ ও প্রকাশ্য আন্দোলনকারীগণের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, ক্রমশ গুপ্ত-সমিতির করায়ত্ত হইতে লাগিল, তখন সরকারও উপদ্রব দমনের নূতন পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। গণেশপন্ত এই সময়ে বোম্বাইয়ের হাঙ্গামা সম্পর্কে ছয় মাস কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সদ্য মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

এক দিকে জনসাধারণের তীব্র অসন্তোষ, অপর দিকে সরকারের

সন্ত্রস্ত সতর্কতা উভয়ে মিলিয়া দেশের বুকে যে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, গণেশপন্ত সেই অবস্থার সুযোগ লইতে ব্যস্ত হইলেন, এবং ব্যস্ততাপ্রযুক্ত ফলাফল বিষয়ে দৃষ্টি রাখেন নাই। যাহা হউক, এই সময়ে তিনি দেশবাসীকে সশস্ত্র বিদ্রোহে আহ্বান করিয়া কতকগুলি উত্তেজনাপূর্ণ পুস্তিকা প্রণয়ন করিলেন, এবং সেগুলি যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র সমভাবে বিতরিত হয়, তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিলেন। এই পুস্তক প্রণয়ন করার জন্য গণেশপন্ত ১২৪ক ধারা অনুযায়ী সম্রাটের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের অভিযোগে ধৃত হইলেন। তাঁহার গৃহে খানাতল্লাস করা হইল এবং পাওয়া গেল বিস্ফোরকপ্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধীয় কতকগুলি পুস্তিকা, এবং বিপ্লব-সমিতির কতকগুলি মূল্যবান দলিল। বিচারে গণেশপন্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। যথারীতি হাইকোর্টে আপীল করা হইল, কিন্তু আপীল অগ্রাহ্য হইল এবং পূর্ব্ব দণ্ডাদেশ বহাল রহিল।

এই সংবাদে দেশবাসী অভিভূত হইয়া পড়িল। ঐরূপ কঠোর দণ্ডাদেশ আন্দোলনের ইতিহাসে নূতন ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে ছয়জন ভারতীয় যুবক সর্ব্বপ্রথম জন্মভূমির বুক হইতে চিরনির্ব্বাসিত হন, গণেশপন্ত তাঁহাদেরই অন্যতম। বিনায়ক সংবাদপত্রে এ সংবাদ পাঠ করিলেন এবং বুঝিলেন যে, আঘাত প্রত্যক্ষভাবে সাভারকর-পরিবারকে আহত করিলেও, পরোক্ষভাবে ইহা অভিনব-ভারতকে লক্ষ্য করিয়াই উদ্যত। মানিকতলার বোমার মামলার রায় তখনও সমিতির লণ্ডনস্থ শাখার আলোচনাধীন ছিল; কিন্তু আলোচনার ফল যে কি হইল, তাহা জানা যায় নাই। তবে সমিতির সভ্যগণের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তন এই দেখা গেল যে, ইণ্ডিয়া-হাউসের অন্যতম সভ্য মিঃ ধিংড়া সমিতির সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া, মিঃ কার্জন উইলি

প্রমুখ সরকারী কর্ম্মচারীগণ-পরিচালিত এক প্রমোদ-সভায় যোগদান করিলেন। ক্রুদ্ধ ভারতীয় যুবকগণ এই ব্যাপারে ধিংড়ার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া প্রকাশ্য সভায় তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করিতে মনস্থ করিলেন। বিনায়ক কিন্তু তাঁহাদিগকে এই বলিয়া নিরস্ত করিলেন যে, যদিও ধিংড়া দলত্যাগী, তথাপি তাঁহার অতীত আচরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

সরকার আশা করিয়াছিলেন, সাভারকর-পরিবারের উপর প্রযুক্ত আঘাত বিনায়কের ঔদ্ধত্য অনেক পরিমাণে সংযত করিবে। তাহার উপর আবার ভারতে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত; গৃহে আছেন, তাঁহার স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা শোকসন্তপ্তা ভ্রাতৃজায়া, আর আছে সপ্তদশবর্ষীয় একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে সরকার যদি আশা করেন যে, বিনায়ক আর বিপ্লব-প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকিয়া তাঁহার অসহায় পরিবারের দুর্দ্দশা আরও বাড়াইয়া তুলিবেন না এবং এই বিপ্লব ও হিংসার গোপন পথে স্বাধীনতা-লাভের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া সংসারচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিবেন, তবে তাহা আদৌ অসঙ্গত হয় না। ইহাই হইল স্বাভাবিক অনুমান, কিন্তু যেহেতু বিপ্লবী বিনায়ক বিধাতার একটি বেহিসাবী সৃষ্টি, সেইজন্য তাঁহার কার্য্য-কলাপও বেহিসাবী, অদ্ভুত। কাজেই সেই সঙ্কট-মুহূর্ত্তেও যখন বিপন্ন অসহায় পরিবারের দুর্গতি তাঁহাকে মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত করিতেছে, এবং চির-নির্ব্বাসনের নিশ্চিত আশঙ্কা প্রতি নিমেষে তাঁহার নিকটতর হইতেছে, তখনও বিনায়ক যাহা করিলেন, তাহা বিনায়কের মত অদ্ভুত বিপ্লবীর জীবনের পক্ষেই সম্ভব। তিনি সেই দারুণ দুঃসময়ে তাঁহার ভ্রাতৃজায়াকে

মারাঠী কবিতায় যে পত্রখানি লিখেন, তাহাতেই তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থার চিত্র সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিম্নে সেই কাব্য-লিপিখানির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল—

"ভগ্নী, আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। আপনার সস্নেহ লালনপালন আমাকে কোন দিন মাতৃস্নেহের অভাব বোধ করিতে দেয় নাই। আপনার পত্র পাইয়া সত্যসত্যই আমি নিজেকে ভাগ্যবান ও শতধন্য মনে করিতেছি। আর ধন্য শুধু আমি নই—ধন্য আমাদের বংশ যে, সে ভগবৎ-সেবার সুযোগ পাইয়াছে। বনে কত ফুল ফোটে এবং ঝরিয়া পড়িয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে? কিন্তু গজেন্দ্র যে ফুলটি আহরণ করিয়াছিল তাহার নিজের মুক্তি-কামনায় ভগবানের চরণে অর্পণ করিবার জন্য, কবির লেখনী তাহাকে অমরতা দান করিয়াছে। তেমনই, আমাদের শৃঙ্খলিতা বন্দিনী জন্মভূমি আপন মুক্তি-বর যাচিয়া লইবার মানসে দেবার্চ্চনার জন্য, আমাদের পরিবার-রূপ পুষ্প-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফুলটি চয়ন করিয়াছেন। ধন্য সে উদ্যান, যে প্রভুর পূজা এবং সেবার জন্য ফুলের অর্ঘ্য দান করিয়াছে। সে উদ্যানে আরও যে কয়টি ফুল আছে, তাহা তাঁহারই চরণে এমনই ভাবেই উৎসর্গীকৃত হউক, দেবতার মাল্য-রচনার জন্য যে উদ্যানকে ফুল যোগাইতে হয়, তাহা নিত্যকুসুমিত। জননী, তুমি আবার এই ফুলবনে প্রবেশ কর, এবং নব-রাত্রি উৎসবের মালা গাঁথিবার জন্য অবশিষ্ট ফুলগুলি একে একে চয়ন করিয়া লও। নব-রাত্রির মালা গাঁথা শেষ হইলে, নব-রাত্রির মহোৎসব সম্পন্ন হইলেই মহামায়া অবতীর্ণ হইয়া ভক্তকে বিজয়-বর দান করিবেন। ভগ্নী, আপনিই আমার শক্তি ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস। আপনি যখন নিজেকে এই মহাব্রতের বলিরূপে উৎসর্গ করিয়াছেন, তখন সেই ব্রত উদ্‌যাপনের যোগ্যতর নিজেকে করিয়া

তুলিতেই হইবে। ওই দেখুন, জাতির গৌরবময় অতীত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আপনার পানে সোৎসুক নয়নে চাহিয়া আছে। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে এই কর্ত্তব্য সম্পাদনে শক্তি দিন; আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই সুকঠোর সাধনা আমাদের জয়যুক্ত হয়।"

গণেশপন্তের কঠোর সাজায় ক্ষিপ্ত হইয়াই যেন ইহার পর হইতে বিনায়ক বৈপ্লবিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা আরও প্রবলতর বেগে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এরূপ কর্ম্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু প্রতিটি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়া সর্ব্বশেষ পরীক্ষাতেও কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; কাজেই ব্যারিস্টাররূপে তিনি তখন বারে যোগদানের অধিকারী। কিন্তু সরকার তাঁহার কর্ম্মতৎপরতা দমনে কৃতসঙ্কল্প, কাজেই তাঁহাকে বারে যোগদানের জন্য আহ্বান না করিয়া আদালতে অভিযুক্ত করা হইল। ভারতীয় পুলিস এই অভিযোগের সাক্ষীপ্রমাণ সরবরাহ করিতে লাগিল, কিন্তু দেওয়ানী বিচারালয় কর্ত্তৃক ফৌজদারী বিচার-বিভাগের কর্ত্তব্য অন্যায়ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়াতে, বিলাতী সংবাদপত্রসমূহ এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল যে, সরকার অবশেষে মামলা উঠাইয়া লইলেন, এবং বিনায়ক অতঃপর রাজদ্রোহজনক কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন, এই শর্ত্তে তাঁহাকে বারে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন। তদুত্তরে বিনায়ক সরকারকে জানাইলেন যে, সেরূপ কোন শর্ত্তে আবদ্ধ হওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাঁহার বিপ্লব-কার্য্যে লিপ্ত থাকা সম্বন্ধে যদি সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রকাশ্য প্রমাণ থাকে, তবে তাঁহাকে আইনানুযায়ী অভিযুক্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে যথাবিহিত দণ্ডদান করা যাইতে পারে। আর, তাহা ছাড়া, রাজদ্রোহের অর্থ এমন অস্পষ্ট এবং তৎসম্বন্ধীয় আইনের প্রয়োগ এমন ব্যাপক যে, সে সম্বন্ধে কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ

হওয়া কার্য্যত অসম্ভব, কারণ এমনও দেখা গিয়াছে যে, মাত্র "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিও অনেক সময় রাজদ্রোহিতারূপে গণ্য হয়। অতঃপর সরকার বিনায়ককে বারে যোগ দিবার জন্য আহ্বানও করিলেন না, অথবা ব্যবহারজীবীগণের তালিকা হইতে তাঁহার নামও কাটিয়া দিলেন না। ফলে বিনায়ককে ত্রিশঙ্কুর ন্যায় বিলম্বিত অবস্থায় রহিতে হইল।

এই সময়ে সহসা একদিন প্রাতঃকালে সংবাদ রটিল যে, সার্ কার্জন উইলি জনৈক ভারতীয় যুবক কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। যে সংবাদপত্রের প্রাতঃসংস্করণ এই সংবাদ লইয়া বাহির হইয়াছিল, তাহার শত সহস্র খণ্ড অত্যল্পকালমধ্যেই বিক্রীত হইয়া গেল। দলে দলে উত্তেজিত ইংরেজদিগকে পথিপার্শ্বে, হোটেলে ও পার্কে এই ব্যাপার লইয়া বাদানুবাদ করিতে দেখা গেল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তৎপূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ভারত-শাসনকার্য্য অতি সহজ এবং স্বচ্ছন্দ ভাবেই চলিয়া আসিতেছিল, তাই ইংরেজ জনসাধারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, কোন্ অভাব ও অভিযোগের তাড়না বা কিসের অসন্তোষ ভারতীয়দিগকে সহসা রুশিয়ার বিপ্লব-পন্থা অনুসরণে অনুপ্রাণিত করিল। সংবাদপত্রগুলির সান্ধ্য-সংস্করণে দেখা গেল যে, সাভারকর-পরিচালিত 'স্বাধীন ভারত সঙ্ঘ' ও 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান দুইটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য এবং রাজভক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানগণ-পরিচালিত প্রমোদ সমিতির বর্ত্তমান সভ্য ধিংড়া এই হত্যাকাণ্ডের নায়ক। এই ব্যাপারে শুধু ইংলণ্ডের নয়, কন্টিনেন্টের প্রায় অধিকাংশ পত্রিকাই সপ্তাহকাল ধরিয়া লণ্ডনের হত্যাকাণ্ডের আলোচনায় পূর্ণ হইয়া বাহির হইতে লাগিল, এবং এই সূত্রে ভারতীয় বিপ্লব-সমিতির আরও কি গূঢ় তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়ে জানিবার উৎকণ্ঠায় সমগ্র ইউরোপ রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

এই হত্যাকাণ্ডে ইংরেজের শঙ্কিত ও চিন্তিত হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতীয়গণের মধ্যেও যে ইহা কম বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ভবনগরী ও আগা খাঁ প্রমুখ ভারতীয় নেতৃবর্গ এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। এমন কি, ধিংড়ার পিতা এই নৃশংস হত্যা-ব্যাপারের বিরুদ্ধে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা জ্ঞাপন করিয়া লণ্ডনে তার করিলেন, এবং ধিংড়াকে নিজের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে যে তিনি লজ্জিত, ইহাও উল্লেখ করিলেন। লণ্ডনপ্রবাসী ভারতীয়গণের উদ্যোগে এক সভা আহূত হইল, এবং সেই সভায় ভারতের খ্যাতনামা বাগ্মীগণ অতি তীব্র ভাষায় এই জঘন্য হত্যাকার্য্যের নিন্দা করিলেন, এবং তাহাদের রাজানুগত্যের কথাও এই প্রসঙ্গে উত্থাপন করিলেন।

বিপ্লবীগণ অতি সতর্ক দৃষ্টিতে সকল ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিলেন, এবং ধিংড়ার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনরূপ হীন মন্তব্য উচ্চারিত হইলে সভা পণ্ড করিয়া দিতে হইবে—এই যুক্তি করিয়া তাঁহারাও প্রতিবাদ-সভায় উপস্থিত হইলেন। ভারতীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় গোয়েন্দা গুপ্তচর দলে দলে সভাগৃহ পূর্ণ করিয়া তুলিল, এবং বক্তার পর বক্তা উঠিয়া হত্যা-কার্য্যের এবং ব্যক্তিগতভাবে হত্যাকারী এবং সমষ্টিগতভাবে তাহার সম্প্রদায়ের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থাকে নিন্দা করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধিংড়ার জঘন্য হত্যাকার্য্যের নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব রচিত হইল। তাহা সমর্থিতও হইল, এবং প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট না লইয়াই "সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল" বলিয়া সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের ঘোষণাবাণী যখন অর্দ্ধসমাপ্ত, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটি যুবক উঠিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া বসিল, না, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই।

যুবকের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া দিয়া সভাপতির কণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল, হইয়াছে, হইয়াছে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। পুনরায় প্রতিবাদ হইল, না, কখনও হয় নাই। মাননীয় আগা খাঁ প্রতিবাদকারীকে সম্মুখে আসিতে আহ্বান করিলেন, অমনই মিলিত কণ্ঠ তাহার নাম এবং পরিচয় দাবি করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। সভাগৃহের এক প্রান্ত হইতে উত্তর আসিল, এই যে, আমি এখানে; আমার নাম সাভারকর। সমস্ত সভাগৃহ যেন উত্তেজনায় উন্মত্ত। কেহ বলিল, লাথি মার। কেহ বলিল, টানিয়া আন। আবার কেহ বা সভাগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিবার পরামর্শ দিল। কিন্তু এত তর্জ্জন-গর্জ্জন, এবং আক্রমণ-আস্ফালনের মধ্যেও যুবক অচল অটল ভাবে তেমনই দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই, কারণ আমি যদিও একা, তবু আমি ইহার বিরোধিতা করিতেছি। সম্মিলিত জনতার মিলিত দৃষ্টি সেই কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই এক ক্ষীণকায় তরুণ যুবকের সম্মুখীন হইল। অমনই সহস্র কণ্ঠে আবার তিরস্কার বর্ষিত হইল। সেই গোলযোগের মধ্যে একজন ইঙ্গ-ভারতীয় আসিয়া সজোরে সাভারকরের মুখে ঘুষি বসাইয়া দিল। সে আঘাতে তাঁহার চশমা ভাঙিয়া মুখের এক স্থান কাটিয়া গেল, এবং ক্ষতস্থান বাহিয়া রক্তধারা ছুটিতে লাগিল। কিন্তু সেই রক্তরঞ্জিত মুখ লইয়া সাভারকর দৃঢ়তর কণ্ঠে আবার বলিলেন, যখন একজনও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিতেছে, তখন ইহা "সর্ব্বসম্মতিক্রমে" গৃহীত হইল বলিয়া কোন-মতেই স্বীকৃত হইতে পারে না।

আহত নেতার রক্তাক্ত মূর্ত্তি দর্শনে তাঁহার বিপ্লবী সহকর্ম্মীগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। একজন পিস্তল বাহির করিলেন। কিন্তু তাহা বিনায়কের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি ইঙ্গিত করিবামাত্র উদ্যত

আগ্নেয়াস্ত্র নিমেষে যথাস্থানে নিহিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর আর একজন আসিয়া আততায়ীর মস্তক লক্ষ্য করিয়া লাঠি চালাইলেন, অমনই পূর্ব্বোক্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ধরাশায়ী। আহতের আর্ত্তনাদ ও ভয়ার্ত্তের ব্যস্ত চীৎকারে সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আসন্ন বোমা-বিদারণের কাল্পনিক আশঙ্কায় বক্তা ও শ্রোতাগণ চেয়ার বেঞ্চি ও টেবিলের তলায় নিরাপদ আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পুলিস আসিয়া সাভারকরকে গ্রেপ্তার করিল, এবং কেবলমাত্র নিজ মত ব্যক্ত করার অপরাধে সাভারকরের উপর কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রতিবাদ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। অমনই সভা ভঙ্গ হইল, এবং সন্ত্রস্ত জনতা অক্ষত দেহে উন্মুক্ত রাজপথে বাহির হইতে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধের পর সাভারকর পুলিসের কবল হইতে মুক্তি পাইলেন, এবং শুধু মুক্তিই পাইলেন না, এরূপ অন্যায়ভাবে আক্রান্ত হওয়ার দরুন পুলিসের অনুতপ্ত সৌজন্য ও বিনয়-বচনে আপ্যায়িত হইলেন। পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে চাহিলেন, সাভারকর তাঁহার আক্রমণকারীকে অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন কি না। উত্তরে বিনায়ক জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার প্রাপ্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, আর অধিক কিছু করিবার তাঁহার ইচ্ছা নাই।

পুলিসের কবল হইতে মুক্ত হইয়াই, সাভারকর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সভায় আচরণের সমর্থনকল্পে 'টাইম্‌স' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রেরণ করিলেন। তিনি লিখিলেন যে, হত্যাকারী বলিয়া যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছেন, তিনি তখনও বিচারাধীন আসামী, আদালতে তাঁহার দোষ তখনও প্রমাণিত হয় নাই, কাজেই তিনি যে প্রকৃতই হত্যাকারী—এ কথা পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধান্ত করিয়া লইলে ধর্ম্মাধিকরণের অপমান করা হয়।

আর হত্যাই যদি তিনি করিয়া থাকেন, তবে সুস্থ মস্তিষ্কে ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া করিয়াছেন, অথবা রাজনৈতিক কোন কারণের উত্তেজনায় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাও বিচার্য্য। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ব্বাহ্ণে প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক প্রস্তাব আনয়ন করা, এবং চীৎকার ও বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিবাদকারীর কণ্ঠরোধ করিয়া প্রস্তাব "সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে" বলিয়া ঘোষণা করা সভাপতির পক্ষে অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা ও মূঢ়তার পরিচায়ক হইয়াছে। সর্ব্বশেষে তিনি মন্তব্য করিলেন যে, খাস শ্বেতাঙ্গ-সমাজ যে ব্যাপারে এখনও নীরব, ভারতীয়গণের তাহা লইয়া তাড়াতাড়ি এরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিবার সন্ত্রস্ত ব্যস্ততা সভ্য-জগতের চক্ষে অতি হাস্যকর ভীরুতা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বলিয়াই তাঁহার ধারণা। এই পত্রখানি 'টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রকাশিত হইল, এবং কিছুদিন ধরিয়া ইংলণ্ডের রাজনীতিক-মহলে আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে ধিংড়ার বিচার আরম্ভ হইল। গ্রেপ্তার হইবার সময় তাঁহার নিকট যে একখানি পত্র পাওয়া যায়, তাহাতেই কার্জ্জন উইলিকে হত্যার উদ্দেশ্য লিখিত ছিল, কিন্তু তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও পুলিস সে পত্রখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিল না, কাজেই ইংরেজ জনসাধারণ সে সম্বন্ধে তখনকার মত অন্ধকারেই রহিয়া গেল। কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ ভদ্রলোক ধিংড়াকে এই বলিয়া পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে, তিনি যেন বলেন, সাহেবকে তিনি সজ্ঞানে হত্যা করেন নাই, কারণ তাহা হইলেই ব্যাপারটাকে উন্মাদের কাণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সহজ হইবে; কিন্তু ধিংড়া কোন প্রকার আত্মপক্ষ-সমর্থনে তো সম্মত হইলেনই না, উপরন্তু এক সুদীর্ঘ ও তীব্র বক্তৃতায় ঘোষণা করিয়া বসিলেন যে, সশস্ত্র বিদ্রোহ দ্বারা দেশ স্বাধীন করিবার প্রয়াসের

অভিযোগে কয়েকজন ভারতীয় যুবককে চিরনির্ব্বাসন ও মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতি গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করিবার প্রতিশোধ লইবার জন্যই তিনি কার্জন উইলিকে হত্যা করিয়াছেন। তাঁহার এই নির্ভীক স্বীকৃতি সমগ্র পৃথিবীর সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া সভ্য-জগতের কৌতূহল নিবৃত্তি করিল; সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের করায়ত্ত তাঁহার স্বীকারপত্রখানিও রহস্যজনকভাবে পুলিসের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসহ "আহ্বান" শিরোনামা লইয়া মুদ্রিত পুস্তিকাকারে আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইল। কিন্তু ইংরেজী সংবাদপত্রে ধিংড়ার স্বীকারোক্তির স্থান হইল না। তাই এক কৌশল অবলম্বন করা হইল। ভারতীয় বিপ্লবীগণের এক আইরিস বন্ধুর দ্বারা সঙ্গোপনে ও সম্পাদকের অজ্ঞাতসারে উদারনৈতিক দলের মুখপত্র 'ডেলি নিউজে' উহা প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইল। যথাসময়ে উহা প্রকাশিত হইল, এবং সাধারণ জনমণ্ডলী হইতে মন্ত্রীমণ্ডল পর্য্যন্ত সর্ব্বস্তরের লোকের দ্বারা সাগ্রহে পঠিত হইল। উদারনৈতিক দলের অধিনায়ক লয়েড জর্জ ও চার্চিল পর্য্যন্ত উহা পাঠ করিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, সাহিত্যিক উৎকর্ষতার দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে উহা ঐ জাতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য; এবং মিঃ হাইণ্ডম্যান 'জাস্টিস' পত্রিকায় লেখেন যে, ধিংড়ার কর্ম্মপন্থা যদিও তিনি সমর্থন করিতে পারেন না, তথাপি তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি যে সকল অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। ধিংড়ার 'আহ্বান' যে কি উপায়ে সংবাদপত্রে আত্মপ্রকাশ করিল, তাহা লণ্ডন-পুলিসের নিকট এক জটিলতম রহস্যই রহিয়া গেল; কিন্তু সাধারণে অনুমান করিল যে, উহা সাভারকরেরই রচিত, এবং যে খণ্ড ধিংড়ার সহিত পুলিসের হস্তগত হয়, উহাই একমাত্র নয়,

স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগকে অপদস্থ এবং অপ্রতিভ করিবার অভিপ্রায়ে অভিনব-ভারত-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ উহারই অনুলিপিখানি মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করিয়াছেন। এই জনরব এবং ধিংড়ার সহিত হাজতে সাভারকরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা ও সাক্ষাৎ লাভ পরোক্ষভাবে সাভারকরকে সেই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত করিয়া দিল। কিন্তু ধিংড়া তাঁহার সঙ্কল্পে অটল, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ গ্রহণ না করিয়া নিজ কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ ফাঁসির রজ্জু আলিঙ্গন করিতে সর্ব্বদা উৎসুক রহিলেন। তাঁহার এই নির্ভীকতা বিচারকদিগকে অভিভূত করিয়াছিল। শেষে যখন দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইল, ধিংড়া বিচারকদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলিলেন, আজ মরণের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, হিন্দুর সন্তান আমি, মায়ের মুক্তির জন্য যেন বার বার হিন্দুস্থানের কোলেই ভূমিষ্ঠ হই, হিন্দু-স্থানের সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করি। ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতীয়গণ ধিংড়ার ফাঁসির দিন অনশন পালন করিলেন, এবং ধিংড়ার শবদেহের হিন্দুপ্রথানুযায়ী সংকার করিবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন করিলেন; কিন্তু সবই ব্যর্থ হইল। শবদেহ সমর্পিত হইল না, জেল-প্রাঙ্গণেই সমাহিত হইল।

ইহার পর স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-দল ভারতীয়-মাত্রেরই উপর দৃষ্টি রাখিতে আদিষ্ট হইল, কিন্তু তাহাদের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হইল 'ইণ্ডিয়া হাউস'। গুপ্তচরদিগের সতর্ক দৃষ্টি এবং বিরক্তিকর ব্যবহার সাধারণ ভারতীয়দিগকে বহুলপরিমাণে অসুবিধাগ্রস্ত করিল বটে, কিন্তু সাভারকর-সঙ্ঘ কার্য্য করিয়াই যাইতে লাগিলেন। একজন সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি একদিন সাভারকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, গোয়েন্দা-বিভাগের সদাসতর্ক অনুসরণ তাঁহার পক্ষে বিরক্তিকর কি না। উত্তরে

সাভারকর বলিলেন যে, তাঁহার বাড়ির সম্মুখে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদা পাহারা দেওয়া যদি তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক বলিয়া মনে না হয়, তবে তাঁহার অসুবিধা বা বিরক্তি বোধ করার কোন হেতুই নাই। কুজ্ঝটিকা এবং রৌদ্র-বৃষ্টি মাথায় করিয়া দিবারাত্রি নির্নিমেষ নেত্রে সাভারকরের ঘরের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকার করুণ দৃশ্য সত্য সত্যই পথচারী সহৃদয় ব্যক্তিদিগের করুণার উদ্রেক করিত। ক্রমশ এই সতর্ক দৃষ্টি এমন প্রখর হইয়া উঠিল যে, ভারতীয় যুবকদিগের পক্ষে স্থায়ীভাবে কোথাও বসবাস করা একরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল, কারণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়া পুলিস কর্ত্তৃপক্ষের কোপদৃষ্টি আহ্বান করিয়া আনিতে কেহই সম্মত ছিল না। চিহ্নিত বিপ্লবীগণের দুর্দ্দশা বর্ণনাতীত, তাঁহাদের আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই, বাসস্থান নাই, এমন কি হোটেল-রেস্টুরেণ্টে প্রবেশের অধিকার পর্য্যন্ত নাই। অবশেষে আরও সহজ ও সুস্পষ্টরূপে বিপ্লবীগণের অনুসরণ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া 'ইণ্ডিয়া হাউস' বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল বটে, কিন্তু সাভারকরের মতে তাহা হইয়াছিল বহু বিলম্বে, কারণ প্রতিষ্ঠানের প্রচারকার্য্য ইতিপূর্ব্বেই আশাতিরিক্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এবং ভারতীয় যুবকগণ সেই বৈপ্লবিক কর্ম্মকেন্দ্র হইতে যে শক্তি ও শিক্ষা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারা যেখানেই থাকুন না কেন, সেই সেই স্থানে জনে জনে এক একটি স্বতন্ত্র 'ইণ্ডিয়া হাউস' গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন, সাভারকর ইহাই মনে করিতেন।

বিলাতে বিনায়কের যখন এই অবস্থা, তাঁহার স্বদেশস্থ সহকর্ম্মীগণ তখন ভারত-সরকারের কঠোর শাসনে বিপর্য্যস্ত। নিকট-আত্মীয়ের তো কথাই নাই, অতি-দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়গণও কেবলমাত্র সাভারকরের সহিত সম্বন্ধ থাকার অপরাধে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন।

এলাহাবাদে লর্ড মিণ্টোর উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে তাঁহার সপ্তদশ-বর্ষীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সন্দেহক্রমে ধৃত হন। কাজেই সাভারকর-পরিবারের শূন্য গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে অবশিষ্ট রহিলেন একটি মাত্র ব্যক্তি—তিনি সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া।

এই সকল মর্ম্মান্তিক ঘটনা-পরম্পরার দুঃসহ আঘাতে সাভারকর ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর গোয়েন্দা-পুলিসের রোষদৃষ্টি তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়াইয়া লইয়া ফিরিতেছিল, কাজেই লণ্ডন মহানগরীর বুকে তিনি এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, যেখানে আপন অবসন্ন দেহভার এলাইয়া দিয়া ক্ষণ-কালের জন্যও নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতে পারেন। একদিন সাভারকর পর পর দুইটি স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া, যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে তৃতীয় একটি স্থানে শয়নের আয়োজন করিতেছেন, এমন সময় সরাইওয়ালা আসিয়া তাঁহাকে জানাইল যে, সেখানে তাঁহার স্থান হইবে না, কারণ ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা-পুলিস আসিয়া তাহার সরাইয়ের সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে ও বামে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এবং ফলে তাহার অন্যান্য ভাড়াটিয়াগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই রাত্রিতেই সাভারকর তাঁহার যৎসামান্য জিনিসপত্র লইয়া সরাই ছাড়িয়া নূতন আশ্রয়ের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন, এবং অবশেষে আশ্রয় পাইলেন এক জার্ম্মান মহিলার গৃহে। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, সুদূর প্রবাসে ঐ সকল ভারতীয় বিপ্লবীদিগকে প্রতিদিন কি দুঃসহ লাঞ্ছনাই না সহ্য করিতে হইয়াছিল! ইহার পর বিনায়ক অবসন্ন দেহমন লইয়া কয়েক সপ্তাহের জন্য লণ্ডন ছাড়িয়া ব্রাইটনে বাস করিতে যান। এই ব্রাইটনের সাগরসৈকতে বসিয়াই গৃহহীন বন্ধুহীন সাভারকর সমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া যে মর্ম্মস্পর্শী কবিতা

রচনা করেন, আজিও তাহা মারাঠার পথে প্রান্তরে লক্ষ কণ্ঠে গীত হইতেছে।

ঝটিকারম্ভ

অত্যধিক দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম হেতু সাভারকরের স্বাস্থ্য দ্রুত অবনতির পথে ছুটিয়া চলিল, এবং পরিশেষে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহকর্ম্মীগণের সস্নেহ সেবাযত্ন সত্ত্বেও যখন উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন জনৈক ভারতীয় চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে ওয়েল্‌সের এক স্বাস্থ্যনিবাসে স্থানান্তরিত করানো হইল। সেখানে রোগশয্যায় শুইয়া থাকিয়াও সাভারকর একদিনের জন্যও পরিপূর্ণ বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করেন নাই। এই সময়েই তিনি শিখ জাতির ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং অবকাশ-সময় অতিবাহিত করিতেন 'তলোয়ার' প্রভৃতি বৈপ্লবিক পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনায়।

ওয়েল্‌সে গমনের এক পক্ষকাল মধ্যেই সাভারকর ডাক্তারের নির্দ্দেশ-মত একদিন সন্ধ্যায় একটু সকাল সকাল শয্যা আশ্রয় করিয়া কোন একটি দৈনিক সংবাদপত্রের সান্ধ্য-সংস্করণ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় সহসা একটি সংবাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, অনন্ত কান্‌হর নামক চিতপবন-শ্রেণীর একজন ব্রাহ্মণ-যুবক, গণেশ সাভারকরকে নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রতিশোধ লইবার জন্য নাসিকের কালেক্টর সাহেবকে গুলি করিয়া মারিয়াছে। এই সময় কোন এক বিশিষ্ট ইংরেজী সাপ্তাহিকের সম্পাদক বিনায়কের সহিত এই স্বাস্থ্য-নিবাসে বাস করিতেছিলেন, তিনি পরদিন সংবাদপত্র পাঠ করিয়া

শুনাইলেন যে, বিনায়কের কনিষ্ঠ সহোদর নারায়ণ এবং তাঁহার সহকর্ম্মীগণ হত্যা ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধোদ্যমের অভিযোগে ধৃত হইয়াছেন। নারায়ণ রাও ইতিপূর্ব্বে বড়লাটের উদ্দেশ্যে বোমা-নিক্ষেপ সম্পর্কে সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়াছিলেন, এবং দীর্ঘদিন পুলিস-হেপাজতে বাস করিবার পর প্রমাণ-অভাবে পুলিস-কবল হইতে সদ্য মুক্তি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছেন। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর নারায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সহিত পুনর্মিলিত হইলেন, কিন্তু সে মিলন স্থায়ী হইল না। মিলনের প্রথম দিন অলক্ষিতে কোথা দিয়া চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই নারায়ণ দেখিলেন, তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য সশস্ত্র পুলিসবাহিনী বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে। নারায়ণ ধৃত হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইলেন, এবং বালিকা ভ্রাতৃবধূর জন্য রাখিয়া গেলেন নির্জ্জন বাসগৃহের অন্তহীন নিঃসঙ্গতার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা।

এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদে দেশীয় এবং বিলাতী উভয়বিধ পত্রিকাই স্বভাবত ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, এবং এই সকল নৃশংস ব্যাপারের অনুষ্ঠানের মূলে যাহার প্রভাব কার্য্য করিতেছে, প্রকাশ্য বিচার-অন্তে তাহার প্রতি যথাযোগ্য দণ্ড-বিধানের জন্য সরকারকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। নাম উল্লেখ না করিলেও সেই অন্তরালের ব্যক্তিটি যে কে, এবং কাহার প্রতি কটাক্ষ করা হইতেছে, সাধারণের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। কোন কোন পত্রিকা আবার ইঙ্গিত করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না; প্রকাশ্যভাবে সাভারকরের নামই উল্লেখ করিলেন, এবং দেশের বুকে অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াও তিনি যে তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করিতেছেন, সরকারের নিকট তাহার কৈফিয়ৎ দাবি করিয়া বসিলেন। ইংরেজ জনসাধারণের এই উষ্মাপ্রকাশ বিনায়কের সহকর্ম্মীগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা

বিনায়ককে কিছুদিনের জন্য ইংলণ্ড ছাড়িয়া ফ্রান্সে চলিয়া যাইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। ফ্রান্সস্থ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হইতেও তিনি এই মর্ম্মে তার পাইলেন; কিন্তু সাভারকর নারাজ। অবশেষে অভিনব-ভারতের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে সকল সভ্যের সমবেত অনুরোধ আসিল—নিজেকে নিরাপদ করিবার জন্য না হইলেও সমিতির সদ্য-আরব্ধ কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিনায়কের অবিলম্বে ফ্রান্স যাত্রা করা কর্ত্তব্য। শুধু যে অনুরোধই আসিল তাহা নয়, তাঁহাকে নিরাপদে ফ্রান্সে পৌছাইয়া দিবার জন্য সমিতি কর্ত্তৃক জনৈক সভ্যও বিনায়কের নিকট প্রেরিত হইলেন। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুরোধ ও উপরোধের চাপে পড়িয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া সাভারকর লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সেখানে সমিতির এক গুপ্ত অধিবেশন হইল। এই গোপন অধিবেশনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ইউরোপপ্রবাসী ভারতীয় ছাত্রসমাজ স্বভাবতই বিলাসপরায়ণ ও আরামপ্রিয়, কিন্তু তরুণবয়স্ক বিনায়কের অসাধারণ প্রতিভা ও অক্লান্ত কর্ম্মতৎপরতা তাহাদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ দৃঢ়ব্রতী নির্ভীক কর্ম্মীসঙ্ঘরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, তাহারা আজ শুধু ভারত-সরকার নয়, ব্রিটিশ সরকারেরও ভীতির হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অভিনব-ভারতের ইংলণ্ডের অধিবেশনে সাভারকরের ইহাই শেষ যোগ-দান। সভাশেষে সাভারকর ভারাক্রান্ত চিত্তে সোদরপ্রতিম সহকর্ম্মী-গণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সাভারকর প্যারিসে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব-সমিতির কর্ম্মকেন্দ্র লণ্ডন হইতে প্যারিসে স্থানান্তরিত হইল। তিনি সেখানে বিখ্যাত পার্শী মহিলাকর্ম্মী ম্যাডাম ক্যামার সহিত একত্র বসবাস করিতে লাগিলেন। দাদাভাই নৌরজি যখন পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন,

তখন এই প্রবীণা মহিলাকর্ম্মীর প্রাণপণ চেষ্টা তাঁহার সাফল্যলাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পর হইতে তিনি মডারেট দলের কর্ম্মপন্থার উপর ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং শেষে 'হোমরুল' আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি নিজে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবেরই পক্ষপাতিনী ছিলেন, কিন্তু শুনা যায়, কার্জনের দমননীতি এবং সাভারকরের নেতৃত্বে লণ্ডনে বিপ্লব-সমিতির উদ্ভব, তাঁহার শান্তিপূর্ণ বৈধ আন্দোলন দ্বারা স্বাধীনতা লাভের বিশ্বাসের ভিত্তি নাকি শিথিল করিয়া দেয়। তিনি সাভারকরেরই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সমিতির প্রচারকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিলেন। জার্মান সমাজতান্ত্রিক দলের এক সভার অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া ক্যামা ভারতের একটি ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা সঙ্গে লইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া যখন তিনি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন বিস্মিত দর্শকগণের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মুহূর্ত্তে আকৃষ্ট হইল সেই শাড়িপরিহিতা ভারতীয় নারীমূর্ত্তির দিকে। বক্তৃতা শুরু হইল, কথা বলিতে বলিতে সহসা ক্যামা বক্ষ-বসনের অভ্যন্তর হইতে অভিনব-ভারতের জাতীয় পতাকাখানি বাহির করিয়া দর্শকদিগের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন, এবং ক্ষণপরে আন্দোলন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ভদ্রমহোদয়গণ, ইহাই ভারতের বিজয়-বৈজয়ন্তী, ভারতীয় স্বাধীনতার মূর্ত্ত প্রতীক। আশা করি, আপনারা দণ্ডায়মান হইয়া এই জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। ইউরোপের বুকে তথাকার স্বাধীন জাতিদিগের সম্মুখে ঐ পতাকাই ভারতের জাতীয় পতাকা বলিয়া প্রদর্শিত হইল—ইহাই সর্ব্বপ্রথম।

প্যারিসস্থ ভারতীয়গণ সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ ও

তাঁহার বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতেই সাভারকরের কয়েক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের স্বল্পপরিমাণ কাজ শীঘ্রই শেষ হইয়া আসিল, কাজেই প্যারিসের কর্ম্মহীন অলস জীবন বিনায়কের দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল; তাহার উপর, ভারত হইতে প্রতি ডাকে নাসিকের কালেক্টর-হত্যার মামলা-সংক্রান্ত নিত্য নব নব দুঃসংবাদ আসিয়া তাঁহাকে ব্যথিত ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল। মামলার আসামীগণের মধ্যে কেহ বিনায়কের সহকর্ম্মী, কেহ শিষ্য এবং কেহ বা সহোদর। আদালতে জবানবন্দি দিবার সময়ে কোন কোন আসামী স্বীকারোক্তি সংগ্রহের অভিপ্রায়ে পুলিসের দ্বারা অনুষ্ঠিত অত্যাচার-কাহিনীর বিবরণ প্রদান করেন; বিনায়কের মনে সে সকল গভীর আলোড়ন উপস্থিত করে। অন্তরঙ্গ বন্ধু, বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী এবং প্রিয়তম সহোদর তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, অন্ধ বিশ্বাসে তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিতে গিয়া, যখন কারাগৃহের অন্ধতম কক্ষে বসিয়া মরণের অপেক্ষায় প্রহর গনিতেছেন, তখন নিজের এই সুদূর নিরাপদ ব্যবধানে বসিয়া থাকা তাঁহার চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ ও অযোগ্য ভীরুতা বলিয়া মনে হইল। অপর দিকে ভারতের মাটিতে পা দিবামাত্র ধৃত ও কারারুদ্ধ হইতে হইবে, ইহা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়া এবং ধৃত হইলে তাঁহাদেরই সমিতির সমূহ ক্ষতি হইবে তাহা নিশ্চিতরূপে জানিয়াও, স্বেচ্ছায় পুলিসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাওয়া তাঁহার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না, তাঁহার বন্ধু এবং সহকর্ম্মীগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তাঁহার ভারতগমনের বিরোধী ছিলেন, এমন কি পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মাও তাঁহাকে ভারতযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, তুমি সেনাপতি, যুদ্ধকালে শত্রুসৈন্যের পুরোভাগে সাধারণ সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে তোমার স্থান নয়। আত্মপ্রশংসা শুনিলে বিনায়ক তরুণীদের ন্যায় সঙ্কুচিত ও রক্তাভ হইয়া

উঠিতেন। এই কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, কিন্তু সাধারণ সৈনিকগণের সহিত সমশ্রেণীতে অবস্থিত রহিয়া শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হওয়াই আমার সৈনাপত্য-কার্য্যের যোগ্যতার প্রমাণ নহে কি? সকলেই যদি নিজের উপর এইরূপ অত্যধিক ও অযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া, শিবিরে অবস্থান করে, তবে যুদ্ধ করিবে কে? তাহা ছাড়া আমার এই আবরণকে ভীরুরা বর্ম্মরূপে পরিধান করিয়া তাহারই অন্তরালে আত্ম-গোপন করিবার সুযোগ পাইবে।

ভারতে পদার্পণ করিলে বিনায়ক যে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইবেন, সে সম্বন্ধে ভারতীয় জনসাধারণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ইংলণ্ড সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন দিনের জন্য সে সন্দেহের ছায়াপাত হয় নাই। ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিবামাত্র দাসত্বের শৃঙ্খল আপনিই খসিয়া পড়ে—ইংলণ্ডের কবির এই অমর গীতি, এই অভয় বাণী তখনও সকলের হৃদয়ে ঝঙ্কৃত হইতেছিল; তাই সাধারণের, এমন কি বিপ্লবীগণেরও, তখন পর্য্যন্ত দৃঢ় ধারণা, কোন প্রকার রাজনৈতিক মত পোষণ করার অপরাধে বিলাতের বিচারালয় কখনও কাহাকেও চরম দণ্ডে দণ্ডিত করিবে না। কাজেই ইংলণ্ডে অবস্থানকালে বিনায়ক যদি গ্রেপ্তারই হন, তথাপি প্রকাশ্য প্রমাণ-অভাবে তিনি যে অব্যাহতি লাভ করিবেন, সে সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহা ছাড়া, ভারত-সরকারের ন্যায় ব্রিটিশ সরকারও যে তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য পরওয়ানা বাহির করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ ছিল না; তথাপি তিনি ইংলণ্ড হইতে প্যারিসে পলাইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কাজেই বিনায়কের মনে হইল, এখন যদি তিনি আবার প্যারিস ছাড়িয়া অন্যত্র কোথাও পলায়ন করেন, তাহা হইলে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অপর সকলেও যদি আপন আপন নিরাপদ আশ্রয়ের অনুসন্ধানে ইংলণ্ড হইতে

স্থানান্তরে সরিয়া পড়ে, তবে অভিনব-ভারতের কার্য্যই বা কে চালাইবে? সেখানকার কার্য্যভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাঁহারাও যদি বিনায়কেরই মত কাল্পনিক ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন, তবে তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবারই বা তাঁহার কি অধিকার থাকিবে?

এই উভয়সঙ্কট অবস্থা ভাবপ্রবণ তেজস্বী যুবকের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন, ভারতে যাওয়া যদি সম্ভবপর না হয়, তবে ইংলণ্ডে তিনি যাইবেনই, কারণ তাহা না হইলে আসন্ন নৈতিক অধঃপতন হইতে সমিতিকে রক্ষা করিবার আর কোনও উপায় থাকিবে না। আর ইংলণ্ডে গিয়া তিনি যদি গ্রেপ্তারই হন, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ধিংড়ার বিচারের পরও সমিতির উদ্দেশ্য-প্রচারে যেটুকু কার্য্য অসমাপ্ত আছে, তাঁহার গ্রেপ্তারের ফলে তাহা অত্যল্প সময়ের মধ্যে আশাতিরিক্তরূপে সুসম্পন্ন হইবে—ইহাই সাভারকর ভাবিলেন।

স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও মন এখনও কার্য্যত চরম পরিণতির সম্মুখীন হইতে ইতস্তত করিতেছে—এইরূপ সন্দেহাকুল চিত্ত লইয়া সাভারকর একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। বালসূর্য্যের রক্তরাগ-রঞ্জিত নির্ম্মেঘ নীলাকাশের নিম্নে নির্ম্মল প্রভাতটি সরসীর বক্ষে স্বর্ণ-শতদলের মত ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়াসমাচ্ছন্ন জনবিরল রাজপথ বাহিয়া চলিতে চলিতে বিনায়ক এক পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সায়রের বুকে মরাল-মিথুনের জলকেলি, কূলে কূলে জলচর পক্ষীর কলগান, তীরে তীরে বায়ু-বিকম্পিত বিবিধ পুষ্পের আনন্দ-নৃত্য, জলে স্থলে সর্ব্বত্র যেন রূপের উৎসব শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রভাত-প্রকৃতির সেই স্বভাবসৌন্দর্য্য চিন্তাকুল কবিচিত্তে যেন সান্ত্বনার প্রলেপ বুলাইয়া দিল, তিনি সেই বাপীতটে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় কিয়ৎক্ষণ বসিয়া

রহিলেন, পদতলে মরাল-মিথুন তেমনই লীলারত, বিহঙ্গমগণ তেমনই গীতিমুখর, ফুলদল তেমনই নৃত্যচঞ্চল। আনমনা বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা হস্তস্থিত সংবাদপত্রের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল; দেখিলেন, নাসিকের কালেক্টর-হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত অভিনব-ভারতের কর্ম্মীগণের বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত কার্ভে প্রমুখ বিশিষ্ট সভ্যগণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু দণ্ডিত ব্যক্তিগণের নামের তালিকার মধ্যে সাভারকর আপন কনিষ্ঠ সহোদরের নাম দেখিতে না পাইয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া, আবার সেই রূপসম্ভারের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেই দণ্ডিত সহকর্ম্মীদিগের দুর্দ্দশার চিত্র তাঁহার মানসচক্ষে ফুটিয়া উঠিল—শৃঙ্খলিত সহকর্ম্মীগণ কারাকক্ষের অন্ধকারে বসিয়া মরণের অপেক্ষায় প্রহর গনিতেছেন। এক দিকে সৌন্দর্য্যের উৎসারিত মহোৎসব, অপর দিকে আসন্ন মৃত্যুর বীভৎস চিত্র, এই দৃশ্যদ্বয়ের সংঘাতে বিনায়কের রূপের নেশা ছুটিয়া গেল, শিষ্য সহকর্ম্মী এবং সহোদরের গলায় ফাঁসির রজ্জু পরাইয়া দিয়া, প্যারিসের প্রমোদ-উদ্যানে বসিয়া সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করা তাঁহার কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া মনে হইল, অনুশোচনা ও আত্মগ্লানিতে তাঁহার হৃদয় পুড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই সেদিন যাহারা তাঁহারই পাশে বসিয়া বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা লইল, তাহারাই আজ তাহাদের আদর্শের জন্য চরমদণ্ড লাভ করিবার অধিকারী, আর তিনি তাহাদেরই গুরু হইয়া, আত্মরক্ষার জন্য পথে প্রান্তরে আত্মগোপন করিয়া ফিরিতেছেন, ইহাই যদি নেতার কর্ত্তব্য হয়, তবে ধিক সে নেতৃত্বে, ধিক সে সেনাপতিত্বে। বিনায়ক স্থির করিলেন, অতঃপর আর নয়, কর্ম্মস্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই হইবে; পুলিস যদি গ্রেপ্তার করিতে আসে, অসহায় শিশুর মত স্বেচ্ছায় তিনি বন্দীত্ব স্বীকার করিবেন না, বাধা দিবেন এবং তাহা সত্ত্বেও যদি

ধৃত হন, তবে সে বন্দীত্বের অপমানকে অক্ষম অদৃষ্টবাদীর মত অখণ্ডনীয় বিধিলিপি বলিয়া মানিয়া লইবেন না, মুক্ত হইবার পন্থা অনুসন্ধান করিবেন। যদি সক্ষম হন, আবার উন্মাদ হইয়া কর্ম্মতরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিবেন; আর যদি সে চেষ্টায় প্রাণ যায়, তবে আদর্শের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার এমন এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইবেন, যাহার তড়িৎ-স্পর্শ জাতির দেহে চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিবে। সাভারকর ভাবিতে-ছিলেন, ভীরুতার কৌশলের দ্বারা আত্মরক্ষা সম্ভবপর, কিন্তু মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য চাই অকপট আত্মত্যাগ, অদম্য মনোবল এবং নির্ভীক কর্ম্মতৎপরতা।

এই রকম ভাবের আলোড়ন বক্ষে বহিয়া, নিশি-পাওয়া নিদ্রিত ব্যক্তির মত বিনায়ক চলিতে আরম্ভ করিলেন; অভ্যস্ত পাদবিক্ষেপে পরিচিত পথ বাহিয়া আপন অজ্ঞাতসারে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং সহকর্ম্মীদিগকে আহ্বান করিয়া নাসিকের দুঃসংবাদ-সম্বলিত সংবাদপত্রখানি তাঁহাদের সম্মুখে নীরবে নিক্ষেপ করিলেন। সেই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদের ক্রিয়া যখন তাঁহাদের প্রত্যেকের চোখে মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, নিজের লণ্ডন যাইবার পক্ষে যে সকল যুক্তিবাণ মুহূর্ত্তপূর্ব্বে বিনায়ক নিভৃতে বসিয়া রসনায় যোজিত করিয়া আনিয়া-ছিলেন, অবসর বুঝিয়া তিনি তখন সেই শাণিত অস্ত্রগুলি বন্ধুদের বিকল অন্তকরণ লক্ষ্য করিয়া একে একে প্রহার করিতে লাগিলেন। নির্ঘাত সন্ধান ব্যর্থ হইল না, ঋজুগতিতে লক্ষ্যে আঘাত করিয়া ঈপ্সিত ফল উৎপাদন করিল; ফলে লণ্ডন-যাত্রার জন্য প্রকাশ্য সম্মতি সংগ্রহ করিতে না পারিলেও প্রতিবাদের উচ্ছ্বাস প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর সাভারকর প্যারিস পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। লণ্ডন-গমন সম্বন্ধে তিনি স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন ইতিপূর্ব্বেই, কিন্তু

নানা বিচার-বিতর্কের আবর্ত্তে পড়িয়া এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়া উঠিতেছিলেন না। অবশেষে সেদিন আসিল, যখন সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া চরম অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। যাত্রার দিন স্থির হইল, এবং নির্দ্ধারিত দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্যারিসপ্রবাসী ভারতীয়গণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও হাসি-অশ্রুর মধ্যে প্যারিস ছাড়িয়া লণ্ডন যাত্রা করিলেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিতে করিতে বিনায়ক তাঁহার সহযাত্রী বন্ধুকে বলিলেন, দেখুন, আমি যে দু-একদিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হব, এই দৃঢ় ধারণা নিয়েই আমি লণ্ডন যাচ্ছি। আপনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, এ কথা জেনে-শুনেও আমি বিলেত যাচ্ছি কেন! তা হ'লেই আমি প্রমাণ করতে পারব যে, আমি শুধু কাজ করতেই জানি নয়, দুঃখ বরণ করতেও জানি। সমিতির কল্যাণকল্পে অক্লান্তভাবে কাজ ক'রে যাওয়ারই এতদিন দরকার ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় নির্য্যাতন বরণ ক'রে নেওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ ব'লে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। তা ছাড়া অন্য কোন কাজের বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে ব'লে আমার মনে হয় না।

ফরাসী রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া বিনায়ক এইবার ইংরেজ-অধিকারে প্রবেশ করিলেন, এবং একটি লণ্ডনগামী ট্রেন ধরিয়া মহানগরীর উদ্দেশ্যে ধাবিত হইলেন। যে কোন মুহূর্ত্তে ধৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাঁহাকে লণ্ডনে অবতরণ করিবার সুযোগ না দিয়াই পথিমধ্যেই যে গ্রেপ্তার করা হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। ট্রেন লণ্ডন স্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইলে, বিনায়ক জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, সাধারণ পোশাক পরিহিত একদল গোয়েন্দা-পুলিস তাঁহারই নাম উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার কামরার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্ল্যাটফর্মে অবতরণ

করিবামাত্র তাহারা সদলবলে আসিয়া বিনায়কের উপর নিপতিত হইল, এবং গ্রেপ্তারের পরওয়ানা দেখিতে চাহিলে, "ওয়েটিংরুমে দেখিতে পাইবেন" বলিয়া অতি অভদ্রভাবে ধাক্কা দিতে দিতে তাঁহাকে বিশ্রাম-কক্ষের দিকে লইয়া চলিল।

বিনায়কের গ্রেপ্তারের সংবাদ দেখিতে দেখিতে দাবানলের মত সমস্ত লণ্ডনে ছড়াইয়া পড়িল। সে রাত্রের মত তিনি হাজতঘরে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহারই প্রেরণায় অনুপ্রাণিত সহকর্ম্মীগণের কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর হইতে বহির্জগতের মুক্ত বায়ু বিনায়কের পক্ষে যেন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ হাজতঘরের অবরুদ্ধ বাতাসে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া যেন তিনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এক দিকে বিবেকের তিরস্কার, অপর দিকে নিন্দুকের বিরুদ্ধ সমালোচনার আশঙ্কা—এই উভয়ে মিলিয়া বহুদিন তাঁহার চোখের ঘুম কাড়িয়া লইয়াছিল; আজ বিবেকের কণ্ঠ রুদ্ধ, নিন্দুকের রসনা সংযত। তাই এক গভীর সান্ত্বনা বক্ষে লইয়া, ব্রিটিশ কারাগৃহের তুষার-স্নিগ্ধ শিলাতল আশ্রয় করিয়া যে তন্দ্রাহীন সুপ্তি তিনি আজ উপভোগ করিলেন, মুক্ত জীবনের সহস্র সম্ভোগের মধ্যে থাকিয়াও বহুদিন তাহা তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই। পরদিন সাভারকরকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। আদালত-গৃহ লোকে লোকারণ্য, পুলিস-প্রহরী-বেষ্টিত সাভারকর বিচার-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র উত্তেজিত জনতা উল্লসিত চীৎকারে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিল, এবং অভিযোগ গঠিত হইবার পর, বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য তাঁহাকে ব্রীক্সটন জেলে প্রেরণ করা হইল।

তাঁহার জেল-জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রতিটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে গেলে গ্রন্থের কলেবর অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবে। সংক্ষেপে

ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ব্রিটিশ কারাগারের সতর্ক অবরোধে রহিয়াও, তাঁহার কার্য্যতৎপরতা কিঞ্চিৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল মাত্র, বন্ধ হয় নাই। জেল হইতে সহসা কিরূপে অন্তর্দ্ধান হওয়া যায়, প্রাচীর-পরিবেষ্টনীর অন্তরালে রহিয়াও সাভারকর তাঁহার বন্ধুদের সহিত সে সম্বন্ধে ষড়যন্ত্র চালাইতেন বলিয়া প্রকাশ। আইরিস, ফ্রেঞ্চ, জার্মান প্রভৃতি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন জাতিসমূহ উৎকণ্ঠিত আগ্রহে তাঁহার মামলার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। চীন, মিশর এবং আয়র্লণ্ডের সংবাদপত্রসমূহে সাভারকরের কর্ম্মপন্থা এবং ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্বন্ধীয় উচ্চমন্তব্যজ্ঞাপক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল। অবশেষে সাভারকর বিচারার্থ ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহকর্ম্মীগণ মামলা-পরিচালনের জন্য প্রকাশ্যভাবে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিলেন; কিন্তু কোন ফল হইল না, নিম্ন আদালতের আদেশই বহাল রহিয়া গেল। ভারতবর্ষেই তাঁহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইবে।

আদালত-রঙ্গমঞ্চে বিচার-অভিনয়ের উপর যবনিকা-পাত হইল, সাভারকর সঙ্গোপনে তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার নিকট একখানি পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন। এই কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্বামী স্বদেশ হইতে চির-নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, পুত্রাধিক স্নেহে পরিপালিত কনিষ্ঠ দেবর কারারুদ্ধ, এবং সর্ব্বশেষ, যাঁহার প্রত্যাগমনপথ চাহিয়া সাভারকর-কুললক্ষ্মী নির্জ্জন গৃহে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছেন, সেই বিনায়ক আজ বিচারের জন্য ভারতে প্রেরিত হইতেছেন—তাঁহার প্রতিও যে অনুরূপ কোন গুরু দণ্ডের বিধান হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বিচারার্থ ভারতে প্রেরিত হওয়ার অর্থ যে চির-নির্ব্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হওয়া,

তাহা সাভারকর নিশ্চিতরূপেই জানিতেন, তাই তাঁহার এই পত্রখানিকে তিনি ইচ্ছা করিয়াই 'শেষ সাধ' নামে অভিহিত করিলেন। ভাষান্তরিত হইলে মুল পত্রখানির রস-মাধুর্য্য রক্ষিত নাও হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বঙ্গানুবাদ দিতে সাহস হইল না। উহাতে না ছিল নির্ম্মম ঔদাসীন্যের হৃদয়হীন মহত্ত্ব, না ছিল অক্ষম ভীরুতার অসহায় বিলাপ, ভ্রাতৃ-জায়াকে অসহায় অবস্থায় ফেলিয়া যাইতে হৃদয়ের প্রতিটি গ্রন্থি যেন ছিঁড়িয়া যাইতেছে—তথাপি আদর্শের আহ্বান উপেক্ষা করিবার শক্তি নাই, প্রবৃত্তিও নাই। পত্রখানির আদ্যোপান্ত ছত্রে ছত্রে এই ভাবসঙ্কট মনোরমভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মার্সেলিস

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইবার দিন সাভারকর তাঁহার বিচ্ছেদব্যথাতুর বন্ধু ও সহকর্ম্মীগণের নিকট হইতে আবেগপূর্ণ ভাষায় লিখিত কতকগুলি পত্র প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার বহিষ্কারের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সেই সকল পত্রের একটি মর্ম্মস্পর্শী উত্তর লিখিয়া জেল-কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে সুকৌশলে ফ্রান্সে প্রেরণ করেন। এদিকে পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ এই দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহী যুবককে ইংলণ্ড হইতে নিরাপদে ভারতে প্রেরণ করিবার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত। পন্থা আবিষ্কৃত হইল অনেকগুলি, কিন্তু কোনটাই তাঁহাদের নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হইল না। লণ্ডন হইতে ভারতে যাইতে হইলে সাধারণত ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের মধ্য দিয়া মার্সেলিস বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিতে হয়, কিন্তু জনরব রটিয়াছিল যে, রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত সাভার-করকে ঐ পথ দিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, ফ্রান্সের প্রতিপত্তিশালী

বিপ্লবী-দলপতি পণ্ডিত শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা নাকি ফরাসী সরকারকে 'হেবিয়াস কোর্পাস' জারি করিতে প্ররোচিত করিয়া উক্ত কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার চেষ্টা করিবেন। কাজেই সেই পথে লইয়া যাইবার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল, এবং স্থির হইল যে, সাভারকরকে লইয়া ইংরেজ-অধিকৃত বিস্কে উপসাগর হইতেই জাহাজ ছাড়িবে, এবং যথাসম্ভব বৈদেশিক বন্দর এড়াইয়া সোজাসুজি ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিবে। তদনুসারে ভারত হইতে এক দল রক্ষী-সৈন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল, এবং স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর সহায়তায় পরিপুষ্ট সেই প্রহরী-বাহিনী এই ভারতীয় বিপ্লবীকে লইয়া বিস্কে উপসাগর হইতে জাহাজে আরোহণ করিল।

জাহাজে উঠিয়াই সাভারকর পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা এড়াইয়া চলিতে গিয়া বিনায়ক এতদিন পদে পদে আপন বিবেকের নিকট তিরস্কৃত হইতেছিলেন, কিন্তু পলায়নের উপায় চিন্তা করা আজ আর তাঁহার নিকট দূষণীয় বলিয়া মনে হইল না। কেন না তিনি প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তিনিও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের মতই নির্য্যাতন ও কারাদণ্ড বরণ করিয়া লইতে পারেন। তবে যে তিনি মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত, তাহা নিজেকে নিরাপদ করিবার জন্য নয়, পরন্তু পুলিসের উদ্দেশ্য পণ্ড করিবার জন্য—তাহা সমিতিরই শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য। তাহা ছাড়া, তাঁহার পলায়নের আরও একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল। ফ্রান্স হইতে ইংলণ্ড আসিলে নিশ্চিত ধৃত হইবেন জানিয়াও, বিনায়ক ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করাতে বিলাতী সংবাদপত্রে তাহা লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। কেহ বলিল, সাভারকর গ্রেপ্তার আসন্ন জানিয়াই, বিখ্যাত আইরিশ বিপ্লবী রবার্ট এমেটের অনুকরণে, ধৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার কোন প্রণয়িনীর

সহিত ইংলণ্ডে দেখা করিতে আসিতেছিলেন। কেহ বলিলেন, অর্থ-সঙ্কটই তাঁহার ইংলণ্ড-আগমনের কারণ। কিন্তু এ সকলের উপর স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগের আবিষ্কার একেবারে অভিনব ও চমকপ্রদ। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তাঁহারা রটনা করিলেন যে, বিনায়কের ইংলণ্ড-আগমন তাঁহাদেরই কৌশলের ফল। কোন একজন বিশিষ্ট বন্ধুর বেনামীতে গোয়েন্দা-বিভাগ কর্ত্তৃক লিখিত একটি পত্রের আহ্বানেই নাকি সাভারকর প্যারিস হইতে লণ্ডন আসিয়া পুলিসের কবলে পতিত হন। 'টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রকাশিত পণ্ডিত শ্যামজীর একখানি পত্র অন্যান্য রটনা অনেক পরিমাণে নিরস্ত করিয়াছিল। এ চিন্তা বিনায়কের চিত্তে যে প্রথম উদিত হইল তাহা নয়, ব্রীক্সটন জেলে অবস্থান-কালেও একাধিক বার তাঁহার মনে সে কল্পনা উঁকি দিয়াছে। তখন ইহা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কারণ বন্ধু-বান্ধবগণের সহায়তা ও অর্থসাহায্য তখন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সুদুর্লভ ছিল না; কিন্তু আজ আবার যখন সে চিন্তার পুনরুদয় হইল, তখন তিনি পুলিসের সতর্কতর দৃষ্টির অধীন, সহায়সম্পদ-হীন বন্দী। পুলিস-কর্ত্তৃপক্ষ জানিতেন যে, বিনায়ক নিজে একজন দুঃসাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ-চরিত্র বিপ্লবী, তাহা ছাড়া, তাঁহার অনুরক্তবৃন্দও কম নহে। নেতার উদ্ধার-সাধনের জন্য এই সব সহকর্ম্মীগণের পক্ষে কোন কার্য্যই যে দুঃসাধ্য নয়, তাহাও তাঁহাদের নিকট অবিদিত ছিল না। কাজেই বিনায়ককে নিরাপদে ভারতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য যাঁহারা ভারপ্রাপ্ত, তাঁহারা সতর্কতা সম্বন্ধে কঠোরতা অবলম্বনে যে অণুমাত্র ত্রুটি রাখিবেন না, ইহাই স্বাভাবিক।

পলায়ন

জাহাজ মার্সেলিসে ভিড়িবে না, ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল ; কিন্তু কার্য্যত দেখা গেল যে, জিব্রাল্টার পার হইয়াই জাহাজখানি ফরাসী বন্দর-অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। এইবার মুমুক্ষু বিনায়কের প্রাণে আশার সঞ্চার হইল ; তাঁহার দৃঢ় ভরসা হইল যে, মার্সেলিস বন্দরে তাঁহার সাহায্যার্থ প্রস্তুত কোন না কোন বন্ধুর সাক্ষাৎ তিনি পাইবেনই। কিন্তু জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে প্রহরী-বাহিনীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া বিনায়ক বহির্জগতের যতটুকু অংশ দেখিতে পাইলেন, তাহার মধ্যে কোন পরিচিত মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। হতাশায় বিনায়কের মন দমিয়া গেল। পলায়নের কোন পথ প্রশস্ত হওয়া দূরে থাকুক, বন্দরে অবস্থানকালে পুলিসের দৃষ্টি এরূপ খরতর হইয়া উঠিল যে, উপায় হইলেও পলায়নের সুযোগ করিয়া লওয়া কার্য্যত একরূপ অসম্ভব। সদা-সর্ব্বদা প্রহরীগণ এত ঘনিষ্ঠভাবে বিনায়কের অনুসরণ করিতে লাগিল যে, মুহূর্ত্তের জন্য তাহাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হওয়া তাঁহার অসাধ্য হইল। কেবলমাত্র স্নান-শৌচাদির সময় কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে একাকী থাকিতে দেওয়া হইত বটে, তবুও সেই স্বল্প সময়ের জন্যও তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল না, স্নান-শৌচাগারের বহির্ভাগে একটি দর্পণ এমন ভাবে বিলম্বিত রাখা হইয়াছিল যে, বিনায়ক দণ্ডায়মান হইলেই তাঁহার চেহারা সেই আয়নার বুকে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাঁহার গতিবিধির কথা বহিঃস্থ প্রহরীর গোচর করিয়া দিত। তথাপি সেই অবস্থাতেই বিনায়ক অপরের অজ্ঞাতসারে দুই দুইবার পলায়নের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং প্রতিবারই অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে। দিবালোক-দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুষের পাণ্ডুর তরলান্ধকারের মত তাঁহার পলায়নের শেষ আশাটুকু বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু উপায় কি? শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীগণ নিদ্রা যাইতেছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রহরীগণ সজাগ এবং সতর্ক। এরূপ অবস্থায় পলায়নের চেষ্টা করিলে ধৃত হওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক, এবং ধৃত হইলে এই সকল প্রহরীর হস্তে যে ভীষণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, তাহা বিনায়ক সম্যকরূপেই জানিতেন। তাহা ছাড়া, ইহাও তিনি জানিতেন যে, তাঁহার এই পলায়ন-প্রচেষ্টা তাঁহার মামলার প্রতিকূলে যাইবে। তিনি বিপ্লব-সমিতির প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হইয়াও (গবর্মেণ্টও তাহা জানিতেন) এতদিন এরূপ সুকৌশলে ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছিলেন যে, পুলিস তাঁহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই, এমন কি রাজ-সাক্ষীগণের নিকট হইতেও তাঁহার বিরুদ্ধে এমন কোন স্বীকারোক্তিই নিষ্কাশন করিতে পারে নাই, যাহার বলে আইনত তাঁহাকে সাত বৎসরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। আর এই পলায়ন-প্রচেষ্টার ফলে আইনের শক্তি বহুদূর বিস্তৃত হইবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু যদি কৃতকার্য্য হন, অন্তত যদি অংশতও সাফল্য-লাভ ঘটে, তাহা হইলে? তাহা হইলে, ভারতীয় বিপ্লবীদিগের অভিনব কৃতিত্বের কথা ছড়াইয়া পড়িবে। সকলে বিস্মিত হইবে, ইংরেজও বুঝিতে পারিবে যে, অভিনব-ভারতের নেতাকে বন্দী করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু পলায়নকালে অনুসরণকারী প্রহরীদল যদি গুলি চালায়? তাহাতেই বা ক্ষতি কি? গুলির আঘাতে মৃত্যু, সে তো এই পথের পথিকদের সভাপতির অচিন্তনীয় নহে। আন্দামানের চিরান্ধকার কারাগৃহে আজীবন তিল তিল করিয়া পচিয়া মরা বা ফাঁসির মঞ্চে

প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা সে মৃত্যু সহস্রগুণে বরণীয়।—ইত্যাদি কথা এই ভাবপ্রবণ ও বিপ্লবীদলকে গৌরব দানে উৎসুক যুবচিত্তে উঠিতে লাগিল।

অতি প্রত্যুষেই জাহাজ ছাড়িবার কথা। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিনায়ককে পরিবেষ্টন করিয়া প্রহরী-বাহিনীর সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হইল। বিনায়ক তাঁহার স্বভাবসুলভ মৃদুহাস্যের সহিত রক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্নানাগারে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইবে কি না! প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া একজন প্রহরী দলপতিকে জাগাইয়া সেই স্থানে লইয়া আসিল, এবং অন্য কাহারও হস্তে বিনায়কের তত্ত্বাবধানের ভার না দিয়া সর্দ্দার সাহেব স্বয়ং তাঁহাকে স্নান-শৌচাদির জন্য লইয়া চলিতে উদ্যত হইলেন। বিনায়ক বিস্ময়ে ও বিরক্তির সহিত এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। স্নানাগারে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, উর্দ্ধে কক্ষের ছাদের উপরে একটি রন্ধ্র রহিয়াছে। কে যেন তাঁহাকে অন্তর হইতে বলিয়া দিল যে, উহাই তাঁহার মুক্তির প্রশস্ত পথ। কিন্তু রন্ধ্রমুখে উপনীত হইবার উপায় কি? মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বিনায়ক তাঁহার ড্রেসিংগাউনটি উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া গহ্বরের নিকটবর্ত্তী একটি কাঁটার সহিত সংলগ্ন করিলেন। ইহাই তাঁহার অবলম্বন হইল, এবং এই বস্ত্রখণ্ড আশ্রয় করিয়াই তিনি রন্ধ্রমুখে পৌছিবার জন্য লাফ দিলেন, কিন্তু পারিলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য অজানা আতঙ্কে তাঁহার হাত-পা শিথিল হইয়া আসিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার স্বাভাবিক মনোবল বিদ্যুৎপ্রবাহে সারা দেহে সঞ্চারিত হইয়া অবসন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নব উদ্যমে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিল।

ভিতরের আলোড়নশব্দে চকিত হইয়া প্রহরী কক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিল, এবং যাহা দেখিল তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিবার

পূর্ব্বেই বিনায়ক দ্বিতীয় উদ্যমে গহ্বরমুখে উপনীত হইলেন, শুধু উপনীত নয়, প্রবিষ্ট হইলেন। এতক্ষণে পাহারাওয়ালার চমক ভাঙিল এবং প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই ভয়ার্ত্ত কণ্ঠের অস্বাভাবিক উচ্চ চীৎকারে জুড়িদারদিগকে সচকিত করিয়া তুলিল। শব্দ অনুসরণ করিয়া স্নানাগারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, আসন্ন অবস্থার আভাস বিদ্যুৎচমকে সকলের মনের উপর খেলিয়া গেল। কালবিলম্ব না করিয়া প্রহরীগণ পদাঘাতে কক্ষদ্বার ভাঙিয়া ফেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিল, আসামী সেখানে নাই। গহ্বরমুখে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, তাহা প্রত্যয় করিতে তাহাদের সাহস হইল না। দেখিল, অতি প্রত্যূষের ঈষদন্ধকার সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গঘাতে উৎক্ষিপ্ত ও নিক্ষিপ্ত হইতে হইতে বিনায়ক ভাসিয়া চলিয়াছেন। তাহারা অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিল, কিন্তু ঝাঁপাইয়া পড়িবার সাহস হইল না। তৎক্ষণাৎ সিঁড়ি লাগানো হইল এবং সোপান-সাহায্যে তীরে অবতরণ করিয়া প্রহরী-বাহিনী পলাতক আসামীর অনুসরণ করিল। বিনায়ক ইতিমধ্যে তটের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, আর একটু অগ্রসর হইতে পারিলেই ফরাসী অধিকারে পদার্পণ করেন, এমন সময়ে ভয়ার্ত্ত বিস্ময়ে দেখিলেন, তীরভূমিকে তাঁহার প্রসারিত করের কবল হইতে অন্তরাল করিয়া ডকের সমুচ্চ পিচ্ছিল গাত্র পর্ব্বতের মত দণ্ডায়মান। মুহূর্ত্তের জন্য বিনায়ক বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ভাবিবার অবকাশ নাই, প্রহরী-সৈন্য সন্নিকটে; বিনায়ক ডক বাহিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুদূর উঠিয়াই গড়াইয়া পড়িলেন। অভিনব-ভারতের অবশ্যপালনীয় নিয়মানুযায়ী পর্ব্বতারোহণে তিনি পূর্ব্ব হইতেই অভ্যস্ত, তথাপি ডকের প্রাচীর তাঁহারও নিকট দুরারোহ বলিয়া মনে হইল। তরঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া শরীর অবসন্ন

হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বিরামের অবসর নাই। আবার আরোহণ শুরু হইল, এবং কখন স্খলিতপদ হইয়া, কখন হাত পিছলাইয়া উঠিতে পড়িতে বিনায়ক এইবার সত্য সত্যই তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত ফরাসী-মৃত্তিকায় পা রাখিতে সমর্থ হইলেন। বিনায়ক ভাবিলেন, এইবার একটু বিশ্রাম লইবেন, কিন্তু প্রহরী-দলের উদ্দেশ্য পণ্ড করার বিপুল আনন্দ তাঁহাকে ক্লান্তিবোধের অবসর দিল না। তাহার উপর স্বাধীন ফরাসী রাজ্যের মুক্তবায়ু নিমেষে তাঁহার বন্দীত্বের সকল গ্লানি অপনোদন করিয়া স্বাধীনতার মাধুর্য্যে দেহ-মন অভিসিঞ্চিত করিয়া দিল।

ঘটনার বিবরণ দিতে যতটুকু সময় লাগিল, কার্য্যত ব্যাপারটি ঘটিতে সময় লাগিল তাহা অপেক্ষা অনেক কম। বহুলোকের সমবেত চীৎকারে সহসা বিনায়কের চমক ভাঙিল, তিনি পিছন ফিরিয়াই দেখিলেন, অনুসরণকারী পুলিস-বাহিনী প্রায় তাঁহার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। তখন ব্যবহার-শাস্ত্রের বিতর্কসঙ্কুল ভিত্তিভূমি নিশ্চেষ্ট দাঁড়াইয়া থাকিবার পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি দেখিলেন, শিকার হারাইয়া রক্ষীদল উত্তেজিত হইয়াছে, আইনের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করা এখন অসম্ভব, মুক্তি পাইতে হইলে শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। অনুধাবন তো অব্যাহতই চলিতেছিল, আবার ধাবন শুরু হইল। অগ্রে বিনায়ক ছুটিতেছেন ফরাসী পুলিসের সন্ধানে, পিছনে ব্রিটিশ পুলিস-বাহিনী আসামীর উদ্দেশ্যে। এইরূপে এক মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। এতক্ষণে প্রভাত হইয়া গিয়াছে, মার্সেলিসের রাজপথ যানবাহন এবং পথচারীর গতিবিধিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সম্মুখ দিয়া যাত্রীপূর্ণ ট্রাম ছুটিয়া চলিয়াছে—যে কোন একটি গাড়িতে আরোহণ করিতে পারিলেই বিনায়ক নিরাপদে ফরাসী পুলিসের ঘাঁটিতে গিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি কপর্দ্দকহীন। ইতস্তত

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, যদি কোন পরিচিত ভারতীয় বন্ধুকে দেখিতে পান, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। আর্ত্তকণ্ঠে হাঁকিলেন, একটি পেনি, একটি পেনি, কে আছ বন্ধু, কে আছ মহানুভব, একটি মাত্র পেনি দিয়া বিপন্নের জীবন রক্ষা কর! পথ অবশ্য জনশূন্য নয়। দলে দলে ফরাসী শ্রমিক কল-কারখানায় নিত্য কর্ম্মে চলিয়াছে, বিলাসী এবং সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন, কিন্তু এই অপরিচিত বিদেশী যুবকের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবে কে! তাহারা ভাবিল, হয়তো জাহাজের কোন ভারতীয় লস্কর কাজ ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে এবং জাহাজের কর্ম্মচারীগণ ধরিবার জন্য তাহার অনুসরণ করিতেছে। সকল দেশেই সাধারণ স্তরের লোক স্বভাবত একটু অধিক কৌতূহলী, ফ্রান্সও সে নিয়মের ব্যতিক্রম নহে। কাজেই ইতর জনসাধারণ কৌতুক দেখিবার জন্য ব্রিটিশ পুলিসের সহিত সাভারকরের অনুসরণে যোগ দিল। এইরূপ বন্য পশুর মত তাড়িত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে বিনায়ক সহসা সম্মুখে ফরাসী পুলিসের একজন জমাদারকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, দেখুন, আমি চোর বা বদমায়েস নই, আমি একজন ভারতীয় বিপ্লবী। ইংরেজ পুলিস আমার অনুসরণে নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফরাসী অধিকারে প্রবেশ ক'রে আপনার দেশীয় রাজশক্তির অমর্য্যাদা করেছে। এখন যদি তারা আপনার সমক্ষে ফরাসী রাজ্যের বুক থেকে আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়, তা হ'লে পূর্ব্বকৃত অপমান আরও ঘোরতর হয়ে ফরাসী সরকারকে লাঞ্ছিত করবে, এবং সে লাঞ্ছনার জন্য ন্যায়ত দায়ী হবেন আপনি। সুতরাং শাসন-শৃঙ্খলার রক্ষক হিসেবে আপনার কর্ত্তব্য, ব্রিটিশ পুলিসের আক্রমণ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে, অবিলম্বে আপনার দেশীয় কোন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সমর্পণ করা। কিন্তু বিনায়ক বৃথাই বেনাবনে মুক্তা ছড়াইলেন। জমাদার সাহেব একেবারেই জ্ঞানহীন,

কাজেই সাভারকরের যুক্তিজালের একটাও তাহার অজ্ঞতার বর্ম ভেদ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে ইংরেজের পুলিস-বাহিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং জমাদার সাহেব অবিচলিত চিত্তে বিনায়ককে পুলিসের হস্তে অর্পণ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। বিনায়ক ধৃত হইলে দলপতি আসিয়া তাঁহাকে জাহাজে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিল। কিন্তু আদিষ্ট হইলেও সুবোধ বালকের মত বিনায়ক গেলেন না। তিনি যাইতে অস্বীকার করিলে, বড় বড় জোয়ান যোলজন প্রহরী একযোগে তাঁহার উপর নিপতিত হইল, এবং বলে পরাভূত করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সহসা একজন শ্বেতাঙ্গ সিপাই পশ্চাৎ দিক হইতে বীর বিক্রমে বিনায়কের মাথায় ঘুষি বসাইল। এই আঘাতে আহত হইয়া বিপ্লবী বিনায়কের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তিনি স্থির করিলেন, ইহাদের দ্বারা পথকুক্কুরের ন্যায় মরা হইবে না। যে সিদ্ধান্ত, সেই কাজ। যে কয়জন প্রহরী তাঁহাকে ধরিয়া ছিল, তাহারা বিপর্য্যস্ত বিনায়কের নিকট হইতে আকস্মিক পলায়ন-প্রচেষ্টা প্রত্যাশা করে নাই, কাজেই অসতর্ক অবস্থায় সহসা সজোর টান খাইয়া তাহারা বেসামাল হইয়া পড়িল, এবং বিনায়ক ইত্যবসরে বিদ্যুৎবেগে তাঁহার আঘাত-কারীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাঙ্গ পুলিস ধরা-শয্যা আশ্রয় করিল। অন্যান্য সিপাহীগণ তাঁহাকে পুনরায় বন্দী করিল বটে, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহার উপর আর কোনরূপ অত্যাচার করিতে সাহস পাইল না। সাভারকর আবার জাহাজে নীত হইয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আবদ্ধ হইলেন। প্রতিকূল অবস্থার সহিত অবিরাম সংগ্রামের ফলে বিনায়ক এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মনে হইল, তাঁহার যেন শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এক দিকে সন্তরণ এবং সংগ্রাম-জনিত দৈহিক শ্রান্তি, অপর দিকে ব্যর্থতার

হতাশাসৃষ্ট মানসিক অবসন্নতা—এই উভয়বিধ বিফলতার প্রভাবে পড়িয়া সাভারকর মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন।

জাহাজ বন্দর ছাড়িল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির শেষ সম্ভাবনাটুকুও চিরতরে অন্তর্হিত হইল। সে রাত্রিতে প্রহরী উন্মুক্ত তরবারি হস্তে কক্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল। তদবধি স্নান-শৌচাদির সময়েও বিনায়ককে একা ছাড়িয়া দেওয়া হইত না, দিবারাত্রি হাতে হাতকড়ি দিয়া রুদ্ধকক্ষে আটকাইয়া রাখা হইত। তাঁহার পাদচারণের জন্য মাত্র চার ফিট পরিমিত স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। সেই সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বিনায়ক অপ্রশস্ত জানালা দিয়া তাঁহার লুব্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিতেন বহির্জগতের মুখ দেখিবার আকাঙ্ক্ষায়; কিন্তু দিবালোক যাঁহার নিকট দুর্লভ বস্তু, বাহিরের পৃথিবী তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত করিবে কে? সেই বাতায়ন-বিরল স্বল্পপরিসর কক্ষে বিজলী-বাতি সারারাত্রি অনির্ব্বাণ জ্বলিয়া ঘরটিকে বয়লারের বহ্নিকুণ্ডে পরিণত করিত; বাহিরে উদার সমুদ্রবক্ষে ঝটিকার তাণ্ডব; অথচ দগ্ধ-দেহের জ্বালা জুড়াইতে বিনায়কের নিজস্ব জগৎটিতে বায়ুর প্রবেশ নাই বলিলেই চলে। এই সকল দুঃখ-কষ্টের উপর প্রহরীদের তর্জ্জন-গর্জ্জন এবং ভীতিপ্রদর্শন তাঁহার দুরবস্থা শত গুণ অসহ্য করিয়া তুলিল।

একদিন রাত্রিতে বিনায়ক আপন কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, অদূরে একজন প্রহরী দাঁড়াইয়া, তাহার হাতে নগ্ন তরবারি, কটিবন্ধে পিস্তল। একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে এমন সময় বিনায়ক শুনিলেন, প্রহরী বলিতেছে, কেয়া আওলাদ হ্যায়! অর্থাৎ কি জঘন্য এই সাভারকর জাতটা! সাভারকর একবার ঘাড় তুলিয়া চাহিলেন মাত্র, আবার নিরুত্তরে শুইয়া পড়িলেন। পাহারাওয়ালা ইহা ভয়ের লক্ষণ বলিয়া ভুল করিয়া দ্বিগুণতর

উৎসাহের সহিত গালিবর্ষণ আরম্ভ করিল। এইবার সাভারকর উঠিয়া বসিলেন এবং প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, দেখ, দিনরাত যন্ত্রণার ভয় কাকে দেখাও তোমরা? আজ জীবন-মৃত্যু আমার কাছে একই কথা। কিন্তু তোমরা ভিন্ন অবস্থার লোক। তোমরা চাকরি ক'রে স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ কর, কাজেই তোমাদের জীবনের প্রতি মায়া আছে। তোমরা বাঁচতে চাও, চাকরির উন্নতি এবং বেতনবৃদ্ধি চাও। আমি একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখছি যে, আমার ওপর অকারণ ও অযথা অত্যাচার করলে, আমি কখনই সহ্য করব না। আমি যে একা তোমাদের দশজনকে বাধা দিতে পারব না তা জানি, কিন্তু তাই ব'লে মুখ বুজে অত্যাচার সহ্য করা আমার কাজ নয়; আমি একজনকে লক্ষ্য ক'রে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং তাকে না মেরে আমি মরব না। বাস্তবিক-পক্ষে উহা সাভারকরের নিরর্থক ভীতিপ্রদর্শন নয়। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কক্ষের অতি নিকটে একটি কাঁটার গায়ে একটি ট্রাউজার থাকিত এবং সেই ট্রাউজারের পকেটে একটি পিস্তল থাকিত। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর কোনরূপ অত্যাচার করিতে প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বেই, তিনি এক লম্ফে পিস্তলটি হস্তগত করিবেন এবং প্রমাণ করিয়া দিবেন যে, তাঁহার ভীতিপ্রদর্শন শুধু শূন্যগর্ভ বাক্যসমষ্টি নয়।

বিনায়কের বাক্য এমন জোরের সহিত বলা হইল, তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে এমন দৃঢ়তা ছিল যে, তাহা উপেক্ষা বা অবিশ্বাস করা শ্রোতার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার সহজ দৃঢ় কথাগুলি ব্যর্থ হইল না, প্রহরী এবং কর্ম্মচারীগণের প্রত্যেকেই এই ধারণায় মনে মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিল যে, কথাগুলি বুঝি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে, এবং শৃঙ্খলিত এই বিদ্রোহীর প্রতিহিংসা বুঝি তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই

উদ্যত রহিয়াছে। সুতরাং প্রহরীগণের উদ্ধত কণ্ঠ সহসা সপ্তম হইতে খাদে নামিয়া আসিল। তাহারা বিনায়কের নিকটে আসিয়া অতি শান্ত এবং বিনীত ভাবে বলিলেন, দেখ, আমরা তো তোমার সঙ্গে বরাবরই ভদ্র ব্যবহার ক'রে এসেছি, আর তার বিনিময়ে তুমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রে আমাদের ভাত মারতে উদ্যত হয়েছিলে, এটা কি তোমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতার কাজ হয় নি? সেই কারণে উত্তেজিত হয়ে তোমার ওপর একটু-আধটু দুর্ব্যবহার করা হয়েছে সত্যি, কিন্তু আমরা তোমাকে কথা দিচ্ছি যে, আজ থেকে তুমি আমাদের কাছ থেকে আবার ভদ্র ব্যবহারই পাবে। সাভারকর বলিলেন, তোমরা যা বলছ, তা অনেক পরিমাণে সত্য। কিন্তু ভেবে দেখ, আমারও তো তোমাদের মত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে, তোমরা যখন আমাকে বন্দী ক'রে ফাঁসিমঞ্চে পৌঁছে দেবার ভার গ্রহণ করলে, তখন তোমাদের এ কথা কি মনে হয়েছিল যে, আমার বিয়োগে আমার আপন জন কি মর্ম্মান্তিক ব্যথাই না পাবেন? তোমরা আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেছ সত্য, কিন্তু আমিও তো ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের কারও সঙ্গে কোন দিন অভদ্র আচরণ করেছি ব'লে মনে হয় না। ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ না থাকা সত্ত্বেও যে আমরা পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, সে কেবল অবস্থার গতিকে। পরস্পরবিরোধী স্বার্থই কেবল আমাদের একজনকে অপরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলেছে। তোমাদের চেষ্টা—নিরাপদে আমাকে ভারতে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিমঞ্চে চাপিয়ে দেওয়া, আর আমার চেষ্টা—যে কোন উপায়ে তোমাদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে তোমাদের উদ্দেশ্য এবং উদ্যম পণ্ড ক'রে দেওয়া। কাজেই এ ক্ষেত্রে আমরা কাউকে দোষী করতে পারি না। আমাকে বধ করা যদি তোমরা তোমাদের কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব ব'লে মনে কর, তা হ'লে তোমাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার, বা

অত্যাচার করলে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার অধিকার আমার আছে—এ কথা স্বীকার ক'রে নেওয়া ন্যায়ত এবং ধর্ম্মত তোমাদের উচিত। নয় কি?"

এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই দৃশ্যপট সহসা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বিনায়কের কারাকক্ষ ভিন্ন রূপ ধারণ করিল। প্রহরীগণের উদ্ধত আস্ফালন, নিরন্তর ভীতিপ্রদর্শন, নগ্ন তরবারি প্রভৃতি নিমেষের মধ্যে ভোজবাজির মত কোথায় মিলাইয়া গেল। কিন্তু এসব পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বিনায়কের স্বাধীনতার যে সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছিল, তাহার বিন্দুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হইলই না, উপরন্তু তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের নীতি নিষ্ঠুরতার সহিত অনুসৃত হইতে লাগিল।

তাঁহার পলায়ন-প্রচেষ্টার অন্তরালে দুইটি উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, অনুমিত হয়। প্রথমত, কৃতকার্য্য হইলে ইংরেজের গর্ব্বস্থল স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের গোয়েন্দা-বিভাগকে বিশ্ববাসীর সমক্ষে অপদস্থ এবং অপ্রতিভ করা হইবে; এবং দ্বিতীয়ত পাশ্চাত্য জগতের নিকট ভারতীয় বিপ্লবীগণের বৈপ্লবিক মর্য্যাদা শতগুণ বর্দ্ধিত করা হইবে। কিন্তু এখন, যখন তাঁহার দুইটি উদ্দেশ্যের একটিও সিদ্ধ হইল না, যখন বিপ্লবীর মর্য্যাদা বাড়াইতে গিয়া আপন দুর্দ্দশাই নিরর্থক বাড়াইয়া তুলিলেন, তখন তীব্র অনুশোচনা তাঁহার বন্দীত্বের দুরবস্থাকে দুঃসহরূপে শোচনীয় করিয়া তুলিল।

এইরূপে ভারাক্রান্ত চিত্তে বিনায়ক একদিন আপন কেবিনে বসিয়া আছেন, জাহাজ তখন এডেন বন্দরের কাছাকাছি। এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠিয়া সমুদ্রকে মাতাইয়া তুলিল। সেই ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের বিপুল আলোড়নে দোল খাইয়া বিপ্লবী বিনায়কের ব্যথাতুর চিত্ত সহসা সজাগ হইয়া উঠিল, উন্মত্ত তরঙ্গশীর্ষে জাহাজের নৃত্যের তালে তালে বিদ্রোহী কবির মর্ম্মবীণায় ঝঙ্কার উঠিল। সেই করুণ ঝঙ্কার পাঠকবর্গকে

ইংরেজ একদিন নির্য্যাতিত মানবতার বন্ধুরূপেই সভ্যজগতের নিকট পরিচিত ছিল। কিন্তু ইংরেজই বিদ্রোহী বন্দীকে চাহিতেছে, ফরাসীর এলাকা হইতে বন্দীকে কাড়িয়া লইতেও বাধে নাই। আন্তর্জাতিক আদালতের বিচার হইতে বন্দীকে বঞ্চিত করিবারও চেষ্টা চলিল।

সুতরাং ইংরেজের রাজনৈতিক মতবাদের চিরপ্রচারিত উদারতা সম্বন্ধে বিশ্ববাসীর স্বতই সন্দেহের উদ্রেক হইল, এবং ফলে ব্রিটিশ বুরোক্রেসির নীতিগত নিস্পৃহ ঔদার্য্য ইউরোপ, আমেরিকা, এমন কি সুদূর চীন ও মিশরের সংবাদপত্রসমূহের ব্যঙ্গবিদ্রূপের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটি যাহাতে কোনক্রমেই চাপা পড়িয়া না যায়, সেদিকে মনোযোগ দিবার জন্য 'লা হিউম্যানিটি' প্রমুখ ফ্রান্সের বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহ ফরাসী সরকারকে বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ফ্রান্সের সহিত জার্মানির রাজনৈতিক সম্বন্ধ তখন মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়, এবং একটা মহাযুদ্ধের আশঙ্কায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তখন তটস্থ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে; কাজেই জার্মানির ফ্রান্স আক্রমণের সম্ভাবনা সুনিশ্চিত জানিয়া, ফরাসী সরকার এরূপ সঙ্কটসময়ে ইংরেজের ন্যায় প্রবল মিত্রশক্তির বিরাগ অর্জ্জন করিতে অধিক সাহসী হইল না। ফরাসী জাতি স্বভাবত ভাবপ্রবণ, বিশেষত জাতীয়সম্মানবোধ তাহাদের এত প্রবল যে, সে মর্য্যাদার স্বল্পপরিমিত হানিও তাহারা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে জাতীয় বৃহত্তর কল্যাণ-চিন্তা তাহাকে স্বভাববিরুদ্ধ কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিল। ভারতীয় বিপ্লবী সম্পর্কিত সমস্যার মীমাংসা স্বয়ং না করিয়া ফরাসী সরকার তাহার সমাধানের ভার অর্পণ করিলেন হেগের আন্তর্জাতিক মহাসভার উপর। এই সংবাদ পাইয়াই ভারতীয় বিপ্লবীগণ মহাসভার নিকট একখানি লিখিত আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। প্রকাশ, ফরাসী

জাতির জাতীয়মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত করিবার উদ্দেশে সাভারকর কারাগারে বসিয়াই এক আবেদনপত্র রচনা করেন, এবং জেল-কর্ত্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে তাহা তাঁহার বহিঃস্থ সহকর্ম্মীগণের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। আবেদনপত্রখানি বিপ্লবীগণের করায়ত্ত হইবামাত্র মুদ্রিত হইয়া সভ্যজগতের সর্ব্বত্র বিতরিত হইল। ইহাতে বিনায়কের মামলার পক্ষে প্রত্যক্ষ কোন সাহায্য হইল না সত্য, কিন্তু নিস্পৃহ নীতিবাগীশতার অন্তরালে ইংরেজের বর্ত্তমান সত্যকার স্বরূপটি সুভ্যজাতিসমূহের সম্মুখে নগ্ন করিয়া ধরা হইল।

কারাগারে থাকিয়াও বিনায়ক নিয়মিতরূপে সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের ফলে যে জগদ্ব্যাপী এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই ছিল তাঁহার পরম সান্ত্বনা এবং চরম উল্লাস, ফরাসীর হস্তে পুনরর্পিত হউন আর নাই হউন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবার তাঁহার অবসর বা আবশ্যকতা কিছুই ছিল না।

অনতিকাল পরেই হেগ মহাসভার রায় প্রকাশ হইল। বিচার-অন্তে বিনায়কের প্রহরী-বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর পদের অধোগতির আদেশ হইল, এবং যে ফরাসী জমাদার বিনায়ককে ইংরেজ পুলিসের হাতে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। এইরূপে, পর্ব্বতের মূষিকপ্রসবের ন্যায় সাভারকরের গ্রেপ্তারঘটিত আন্তর্জাতিক গোলযোগের যবনিকাপাত হইলে বিনায়কের এবং নাসিক-হত্যাকাণ্ডের—উভয় মামলার বিচারের ভার, নব-গঠিত এক ট্রাইবিউ-নালের হস্তে অর্পণ করা হইল। বিচারের দিন সশস্ত্র পুলিসবাহিনী-রক্ষিত এক রুদ্ধদ্বার মোটর-লরিতে বাহিত হইয়া সাভারকর আদালত-প্রাঙ্গণে নীত হইলেন। তিনি যখন আসামীর কাঠগড়ায় উঠিতেছেন, সেই সময় সহসা আদালতগৃহ কম্পিত করিয়া বহুলোকের সমবেত

কণ্ঠে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। বিনায়ক চাহিয়া দেখিলেন, আদালত-গৃহ জনশূন্যপ্রায়, কারণ বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া সাধারণের তথায় প্রবেশ সরকার-কর্ত্তৃক সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তথাপি এই উচ্চ চীৎকার কোথা হইতে আসিল স্থির করিতে না পারিয়া বিনায়ক নিম্নদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই দেখিলেন, সোপানের তলদেশে ত্রিশ-চল্লিশজন যুবক সোৎসুক দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছেন। কটাক্ষমাত্রে বিনায়ক চিনিলেন যে, তাঁহারা তাঁহারই শিষ্য ও সহকর্ম্মী সম্প্রদায়। বিনায়কের সহিত যোগসূত্রের অথবা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-সহানুভূতির পরিচয় যে সরকার-কর্ত্তৃক গুরু-শিষ্য উভয়ের বিরুদ্ধেই অকাট্যপ্রমাণরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহা নাসিক-হত্যাকাণ্ডের আসামীগণ যে জানিতেন না তাহা নয়, তথাপি বিনায়কের আবির্ভাব তাঁহাদের চিত্তে যে বিপুল আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা সংযত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত হইল। কাজেই অজ্ঞাতসারে বুকের আবেগ উল্লসিত কোলাহলে মুখ ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

সাভারকর ইতিপূর্ব্বে বহুসম্মানজয়মাল্য পাইয়াছেন, এসবে তাঁহার লোভ ছিল না, নূতনও নহে,—কিন্তু মরণ-পথের যাত্রীদলের এই উন্মত্ত জয়োল্লাস যেরূপ গভীরভাবে তাঁহার মর্ম্ম মথিত করিয়াছিল, জীবনে কোন অভিনন্দনই, কোন মানপত্রই কোন দিন এই মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবীকে সেরূপ বিচলিত করে নাই। বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সাভারকরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদালত হইতে তাঁহাকে একখানি চেয়ার দিতে চাওয়া হইল, কিন্তু বিনায়ক বিনীতভাবে আদালতদত্ত এই বিশেষ সম্মান প্রত্যাখান করিলেন এবং বলিলেন যে, সহকর্ম্মীগণের সহিত একই কাঠগড়ায় দাঁড়াইবার সৌভাগ্য পার্থিব কোন সম্মানের সহিতই তিনি বিনিময় করিতে সম্মত নন।

আসামীগণের মধ্যে বিনায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও সাভারকর ছিলেন। বিনায়ক যখন বিলাত যাত্রা করেন, নারায়ণ তখন পঞ্চদশ-বর্ষীয় কিশোর; তাহার পর চারি বৎসর অতীত হইয়াছে, এবং এখন তিনি কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের সীমায় প্রবেশ করিয়াছেন। সেইজন্য বিনায়ক তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারিলেন না। তাহা ছাড়া অন্যান্য আসামীগণ কৌতুক দেখিবার জন্য নারায়ণকে নিজেদের মধ্যে মিলাইয়া লইয়া বিনায়ককে বলিলেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য। কিন্তু বিনায়ক প্রথম চেষ্টায় সহোদরকে চিনিয়া বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহার এই বিমূঢ় ব্যগ্রতা সহকর্ম্মীগণ অধিকক্ষণ উপভোগ করিতে পারিলেন না। দুই-একবার আসামীগণের মুখের উপর দিয়া দ্রুত দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়াই বিনায়ক কনিষ্ঠ সহোদরকে বাছিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

আদালতে মকদ্দমা উঠিলে বিনায়ক বিচারে কোন প্রকার অংশ-গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, আন্তর্জাতিক বিধি পদদলিত করিয়া ইংরেজ পুলিস তাঁহাকে ফরাসী অধিকার হইতে ছিনাইয়া লইয়া আসিয়াছে, কাজেই আইনের আশ্রয় যদি তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হয়, তবে ফরাসী আইনের আশ্রয়ই তাঁহার গ্রাহ্য। ইংরেজ প্রভুত্ব তিনি স্বীকার করেন না, সুতরাং ইংরেজের আইনের আওতায় দাঁড়াইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুবিধাই তিনি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিনায়ক বিচারকার্য্যের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এমন কি আসামীগণের পক্ষে যখন জীবন-মরণের প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল, তখনও তিনি আপন আসন্ন পরিণাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার। কেবলমাত্র সহযোগী সুহৃদগণের মুক্তির চিন্তায়

ব্যস্ত হইয়া, সওয়াল জবাব চালাইবার জন্য কখনও সরকারী সাক্ষীগণের জবানবন্দির নোট লইতেছেন, কখনও বা ভগ্নোৎসাহ কোন আসামীকে উৎসাহিত করিবার জন্যে প্রেরণা দিতেছেন, আবার কখনও, যাহারা অত্যাচারের ভয়ে স্বীকারোক্তি দিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের উক্তি প্রত্যাহার করিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করিতেছেন। গুপ্তচর ও গোয়েন্দা-পুলিস একের পর এক সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিনায়কের বৈপ্লবিক কার্য্যতৎপরতার সত্যমিথ্যাজড়িত অতিরঞ্জিত বিকৃত বিবরণ 'ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া' অনর্গল উচ্চারিত করাইয়া যাইতেছে। বিনায়ক অবিচল ঔদাসীন্যভরে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার কিছু বলিবার আছে কি না জিজ্ঞাসিত হইলে, সেই সকল সাংঘাতিক সাক্ষ্য-প্রমাণের ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াও, তাঁহার পূর্ব্বোক্তির পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, ব্রিটিশ প্রভুত্ব আমি যখন স্বীকার করি না, তখন তাহার বিচারের অধিকার মানিয়া লইতেও আমি অসম্মত।

আজ রায় বাহির হইবার দিন, আসামীগণ সকলেই আইনের চরম দণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত। আইনের উদ্যত খড়্গ যখন মাথার উপর ঝুলিতেছে, আসামীগণ তখন আপনাদের শ্রেণীবিভাগ লইয়া কৌতুক করিতেছেন। যাঁহাদের দ্বীপান্তরদণ্ড লাভ করিবার সম্ভাবনা তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর কয়েদী, যাঁহারা মাত্র কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং যাঁহারা মুক্তি পাইবার যোগ্য তাঁহারা বৈপ্লবিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্ররূপে পরিগণিত হইলেন। বিচারক রায় পাঠ করিতে উঠিয়াই সর্ব্বপ্রথম সাভারকরের দণ্ডাদেশ ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। বিনায়ক আপন আসন হইতে সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া

তাঁহার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ কঠোর দণ্ড যেন সসম্মানে গ্রহণ করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীরকণ্ঠে সসম্ভ্রমে উচ্চারণ করিলেন, 'বন্দে মাতরম্'। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পর পর সকল দণ্ডাদেশই পঠিত হইল। প্রত্যেকটিই গুরু দণ্ড—হয় দ্বীপান্তর, নয় সুদীর্ঘ সশ্রম কারাবাস। রায় পাঠ শেষ হইলে বিচারকগণ যেই আসন ছাড়িয়া উঠিতে উদ্যত, অমনই সদ্য-দণ্ডিত আসামীগণ সমবেত কণ্ঠে ধ্বনি করিল, 'স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্মী-কী জয়'!

বিনায়ক-সঙ্ঘের বিচার কার্য্যত শেষ হইয়া গেল, কিন্তু সাভারকরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াও শাসক-শক্তির দণ্ডদানের বাসনার যেন তৃপ্তি হইল না। তিনি জ্যাক্সন সাহেবের হত্যার প্ররোচনা দিয়াছেন—এই অজুহাতে তাঁহার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ গঠিত হইল। কিন্তু মার্সেলিসের পলায়ন-বৃত্তান্ত বিনায়কের প্রতি ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল, সেই কারণে, অথবা অন্য যে কোন গোপন কারণেই হউক, চরম দণ্ডে তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইল না। অগত্যা দ্বিতীয় অপরাধের জন্য তাঁহাকে আর একবার যাবজ্জীবন নির্ব্বাসনদণ্ডেই দণ্ডিত করা হইল। দণ্ডাদেশ শ্রবণ করিয়া বিনায়ক তাঁহার স্বভাবসুলভ শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, আমি তোমাদের আইনের কঠোরতম দণ্ড হাসিমুখে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

উপসংহার

মার্সেলিসে বিনায়কের গ্রেপ্তার-ঘটিত আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের ভার হেগ মহাসভার উপর অর্পিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মহাসভা ইংলণ্ডকে ফ্রান্সের হস্তে বন্দী প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বাধ্য করিতে তাঁহার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। কাজেই দ্বিতীয় বার যাবজ্জীবন

দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর বিনায়ক সুদূর আন্দামান দ্বীপে চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হইলেন। সেই সাগরমেখলা জনবিরল দ্বীপবক্ষে বিনায়ক দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বর্ষ যাপন করিয়াছিলেন। আন্দামানের বন্দীশালায় বসিয়া সাগরলহরী দেখিতে দেখিতে বিনায়কের কবি-চিত্তে যে ভাবলহরী লীলায়িত হইয়া উঠিত, তাহার আভাস মাত্র পাওয়া যায় তাঁহার প্যারিসস্থ কোন এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিখিত তৎকালীন একখানি পত্র হইতে। পত্রখানি দৈবক্রমে ব্যারিস্টার মিঃ আসফ আলির হস্তগত হয় এবং তিনি উহার সাহিত্যিক উৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া তাহা রক্ষা করেন। পত্রের মর্ম্ম এইরূপ—

"আমি আজকাল যে কক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছি, সেখান হইতে অনন্ত আকাশের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়। আমি আপন কক্ষে বসিয়া সূর্য্যাস্ত দেখি, এবং পশ্চিমের দিগন্তসীমায় দিগঙ্গনাগণের হোরীখেলা দেখিতে দেখিতে অস্তমান তপনের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলি। আবার মাঝে মাঝে প্রাণ যখন কোন আশ্রয়, কোন অবলম্বন না পাইয়া অসহায় শিশুর মত ডুকরিয়া উঠিতে চায়, তখন বিবেকবুদ্ধি তাহার প্রবীণতার স্মিতহাস্যে শিশুচিত্তকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'কিসের এ বেদনা তোমার, কেন এই ব্যথা? ছি, এই বালকোচিত অহেতুক বিক্ষোভ কি তোমার সাজে? তুমি কি নিজে ভারতের অধীশ্বর হইতে চাহিয়াছিলে? যদি তাহা চাহিতে, তাহা হইলে স্বার্থগৃধ্নু তুমি, এই পরাজয়, এই বিফলতা তোমার ন্যায্য প্রাপ্য। কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন, এবং অন্তরবাসী তাঁহার প্রতিভূরূপে আমিও জানি যে, যশ মান অথবা অন্য কোন স্বার্থই তোমার কামনা ছিল না; এমন কি আত্মসুখও তুমি কামনা কর নাই। তুমি মনে মনে যাহা চাহিতে তাহা অপরের অগোচর হইতে পারে, কিন্তু আমি তাহার সাক্ষী; আমি

জানি, তুমি চাহিয়াছিলে—নিপীড়িত মানবতার জন্য আত্মত্যাগের অধিকার, দুঃখভোগের সৌভাগ্য। তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত, তোমার শক্তির প্রতিটি পরমাণু ব্যয়িত হইয়াছে আত্মনিগ্রহের ভিতর দিয়া জাতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টায়, তবে,—তবে কেন এ অনুশোচনা, কেন এ আক্ষেপ ?' "

সুদীর্ঘ নির্ব্বাসন-কালের মধ্যে দেশবাসী বিনায়ককে বিস্মৃত হয় নাই। ভারতের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে বিনায়কের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্যে ব্যবধান অবশ্য অতি সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে তিনি তাঁহার অংশ এরূপ ভাবেই অভিনয় করিয়া গিয়াছেন যে, তরুণ ভারতের নিকট তাঁহার আবির্ভাব একটা উপকথার অপ্রাকৃত চরিত্রের মতই চমকপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই, তাঁহার নাম, কার্য্যকলাপ ও তাঁহার কাহিনী বেষ্টন করিয়া রহস্যের যবনিকা নিবিড়তর হইয়া ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পর তাঁহার মুক্তির দাবি জ্ঞাপন করাই হইল যেন সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির নিত্যকর্ম্ম। ইউরোপীয় মহাসমরের পর প্রায় সত্তর হাজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একখানি আবেদনপত্র সরকারসমীপে প্রেরিত হইল—বিনায়কের মুক্তির প্রার্থনা করিয়া। নগরে নগরে সভা এবং শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল এই একই উদ্দেশ্যে। রাষ্ট্রীয় সভার প্রতি প্রাদেশিক অধিবেশনে সাভারকরের মুক্তির দাবিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হইতে লাগিল। দেশের লোকে "সাভারকর-সপ্তাহ" পালন করিল। এমন কি নিখিল-ভারত জাতীয় মহাসভার এক অধিবেশনে, স্বয়ং সভাপতি মহাশয় নির্ব্বাসিত বিপ্লবী সাভারকরের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু কোটি কণ্ঠের এই আকুল প্রার্থনা সরকারের দৃঢ়তার দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ঠিক এই সময়েই সরকারের

সাভারকর-নীতির সমর্থনকল্পে 'ক্যাপিটাল' নামক কলিকাতার ইঙ্গ-ভারতীয় কোন এক সংবাদপত্রে 'সাভারকর ব্রাদার্স' সংক্রান্ত এক অদ্ভুত উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। উপাখ্যানটি "ডিচার্স ডায়েরি" হইতে 'ক্যাপিটালে' উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ—

"খাস আন্দামান দ্বীপের সহিত ভারত বা বর্ম্মার বেতার-সংযোগ নাই, আছে পোর্টব্লেয়ারের সহিত কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুনের। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সাভারকর-ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন, খুব সম্ভবত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও কার্য্যতৎপরতার গুণে জেল-কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন যে, তিনি যে শুধু অন্যান্য কয়েদীগণ অপেক্ষা অধিক সুবিধা বা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন তাহা নয়, কর্ত্তৃপক্ষগণ-কর্ত্তৃক বেতার-স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু রাজ-দ্রোহিতা মারাঠার অস্থিমজ্জাগত, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে তাহা তাহার জানা নাই। সুমাত্রা দ্বীপে জার্ম্মানির একটি বেতার-যন্ত্রের ঘাঁটি ছিল, মহাসংগ্রাম শুরু হইবামাত্র সাভারকর সেই অরক্ষিত ব্রিটিশ-অধিকৃত দ্বীপটি অধিকার করিবার জন্য তত্রত্য জার্ম্মান কর্ম্মচারীগণকে এই বলিয়া প্ররোচিত করিতে লাগিলেন যে, দ্বীপটি অধিকৃত হইলে, জার্ম্মানি তাহা ডুবো-জাহাজের আড্ডারূপে ব্যবহার করিয়া, কলিকাতার ব্যবসায়-বাণিজ্য বিপন্ন এবং রেঙ্গুন হইতে ভারতগামী তৈলবাহী জাহাজ ধৃত করিবার সুযোগ পাইবেন। তাহা ছাড়া, ইহাও স্থির হইয়াছিল যে, জার্ম্মান জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র বহন করিয়া আনিয়া সুন্দরবনের কোন নিভৃততম প্রদেশে ঢালিয়া দিলে, সশস্ত্র ভারতীয় বিদ্রোহীগণও সেই আক্রমণে জার্ম্মান সৈন্যের সহায়তা করিবে। আমেরিকা তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই, কাজেই যুধ্যমান যে কোন জাতিকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা তখন তাহার পক্ষে লাভজনক ব্যবসা ছিল। তাই জার্ম্মানি

নিজের দেশ হইতে হাতিয়ার না যোগাইয়া, আমেরিকাতে দুইখানি দ্রুতগামী জাহাজ প্রেরণ করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে, একটিতে আসিবে শুধু রাইফেল, বন্দুক, বারুদ ও গোলাগুলি এবং অপরটিতে বোঝাই হইবে ছয়খানি ডুবো-জাহাজের খণ্ডাংশ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অস্ত্রপূর্ণ জাহাজ ভারত-মহাসাগরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ভারত-সরকারের দ্রুত সতর্কতা অবলম্বনের ফলে চক্রান্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া যায়।”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

শৃঙ্খলিত শত্রুর প্রতি এই আক্রমণ ‘ক্যাপিটালে’র নিজস্ব খেয়াল অথবা তৃতীয় কোন পক্ষের প্ররোচনার ফল, তাহা বলা কঠিন, এবং যে উদ্দেশ্যে ইহার অনুষ্ঠান, তাহাও যে সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহাও নয়। এই অলীক উপাখ্যান রচনার ফলে সাভারকরের মুক্তি আদৌ দূরপরাহত হইল না, বরঞ্চ সমীপবর্ত্তী হইল; এবং ইহার আশু ফল হইল ইহাই যে, কনিষ্ঠ সাভারকর নারায়ণ রাও ‘ক্যাপিটালে’র সম্পাদককে তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত বৃত্তান্ত প্রমাণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং বিনায়ক সাভারকরের সলিসিটার্স বোম্বাইয়ের সুপ্রসিদ্ধ মেসার্স মণিলাল খের ‘ক্যাপিটাল’-সম্পাদকের নিকট এই মর্ম্মে এক নোটিশ প্রেরণ করিলেন যে, হয় সেই উপাখ্যান-রচয়িতার নাম প্রকাশ করা হউক, নয়, এই মিথ্যা বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হউক; অন্যথায় তাঁহার বা তাঁহাদের সম্বন্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ইংরেজ জাতির অন্যান্য দোষ যাহাই থাকুক না কেন, একটা মস্ত গুণ তাহাদের এই যে, অপরিণামদর্শী নীতিপরায়ণতার বালাই তাহাদের নাই। জীবনে তাহারা যদি কোন নীতি মানিয়া চলে, তবে তাহা মানবের শাশ্বত এবং সনাতন নীতি—‘প্রয়োজন’। আজ অবস্থার গতিকে যাহা বলা হইল, কাল অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলেও

যে তাহা জোর করিয়া বজায় রাখিতেই হইবে—এরূপ আত্মঘাতী নীতি-নিষ্ঠা তাহাদের নাই। এ ক্ষেত্রেও জাতীয় চরিত্রের বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। নোটিশ পাইবামাত্র ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জুলাই তারিখের 'ক্যাপিটালে' নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইল—

"The Editor and the publisher of the Capital deeply regret having published the defamatory remarks, which appeared in the 'Ditcher's Diary' in the issue of the Capital, dated 26th May 1921 and hereby tender him an unconditional apology.

"The Editor and the publisher withdraw the remarks made in respect of both the Savarkar Brothers and deeply regret that they should have been published, however innocently."

অর্থাৎ "১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬এ মে তারিখের 'ক্যাপিটাল' পত্রিকার "ডিচার্স ডায়েরি"তে অসম্মানজনক উক্তি প্রকাশের জন্য পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। বিবরণটি কোন ক্ষতিকর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত না হইলেও, উভয় সাভারকর ভ্রাতার সম্বন্ধে যে মিথ্যা মন্তব্য করা হইয়াছে, সম্পাদক ও প্রকাশক তাহা প্রত্যাহার করিতেছেন।"

যুদ্ধবিরতির বহুদিন পরে, বহু আলোচনা আন্দোলন অন্তে সরকার বিনায়ককে আংশিক মুক্তি প্রদান করিলেন। তাঁহাকে আন্দামান হইতে ভারতে আনিয়া বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত রত্নগিরি নামক এক ক্ষুদ্র শহরে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইল। সাম্রাজ্য-গঠনের উপযোগী মহা-শক্তিই এই তরুণ বিপ্লবী যুবকের ছিল, কিন্তু এই পথের অপরিহার্য্য সুদীর্ঘ অবরোধের অন্তরালে তাহা তিল তিল করিয়া জীবন-মৃত্যুর কবলে

আত্মদান করিল। রত্নগিরির নিভৃত পল্লীপ্রান্তে ভারতীয় শক্তির এই অপচয় অখণ্ডনীয় বিধিলিপি বলিয়া মানিয়া লওয়া ছাড়া হতভাগ্য জাতির আর কি সান্ত্বনা আছে ?

পরিশিষ্ট

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখিত]

সুদীর্ঘ আটাশ বৎসর রাজরোষ সহ্য করিয়া, আন্দামান, রত্নাগিরি প্রভৃতি ব্রিটিশ কারাগারের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সমাপ্ত করিয়া, যুবক সাভারকর প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া কারামুক্ত হইলেন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে। ১০ই মে তারিখটি স্মরণীয়—ইংরেজী ১৮৫৭ সালের ঐ তারিখেই আরম্ভ হয় সিপাহী-বিদ্রোহ; আর তাহারই ৮০ম পূর্ত্তি-দিবসে স্বাতন্ত্র্যবীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর স্বাধীনতা লাভ করিলেন।

প্রশ্ন হইল, সাভারকর কোন্ রাজনৈতিক দলে যোগদান করিবেন? সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁহাকে তাঁহাদের দলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কংগ্রেসের কর্ম্মীরা, বিশেষ করিয়া বামপন্থীরা, তাঁহাকে তাঁহাদের দলপতি অবধি করিতে স্বীকার করিলেন। বীর সাভারকর লক্ষ্য করিলেন দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের পরিণাম—মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের কুড়ি বৎসরের অধিক যাবৎ মুসলমান-তোষণের ফল। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য-সাধনের জন্য মুসলমানের যত আবদার, যত দাবি কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছেন ও করিতে রাজি হইয়াছেন, ফল হইয়াছে তাহার ঠিক বিপরীত। মুসলমান তাহার আবদার ও দাবির মাত্রা ক্রমশই বাড়াইয়া চলিতেছে। ফলে হিন্দু মিথ্যা জাতীয়তার জন্য নিজেকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইতেছে; অপর পক্ষে মুসলমান হিন্দুস্থানের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পাকিস্থান করিতে উদ্যত। সাভারকর ভাবিলেন, কি হইবে সে

স্বাধীনতা লইয়া, যে স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্বেই হিন্দুস্থানকে পাকিস্থানে পরিণত করিতে হইবে, যে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বেই হিন্দুকে স্বেচ্ছায় তাহার রাষ্ট্রিক, ধার্ম্মিক ও নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে হইবে? বারাণসীর বিশ্বনাথের মন্দিরে সন্ধ্যারতি দরজা বন্ধ করিয়া করিতে হইবে; কেন না ববম্‌বম্‌ শব্দে ও ডমরুর তালে মুসলমানের নমাজের ব্যাঘাত হইবে। নগর-সংকীর্ত্তন করিতে হইলে থামিয়া থামিয়া করিতে হইবে—অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন হইবে না। "হিন্দুস্থানী" রাষ্ট্রভাষা হইবে, আর তাহা উর্দ্দু-বহুল হইবে। আমার পুত্র পৌত্র রামায়ণ পড়িবে—"জনাব রামচন্দ্রকী সাথ্ বেগম্ সীতাকো সাদি হুঁয়ে থী।" বাংলায়—"রামের বনবাসে দশরথ এন্তেকাল করিলেন"; পাখিরা আর রাত পোহাইলে কলরব করিবে না—"পাখি সব করে রব ফজর হইল"।

আর দেখিলেন, মহাত্মা গান্ধী কর্ত্তৃক 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' দেওয়ার ফলে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন অনুসারে হিন্দুরা সমগ্র ভারতে লোক-সংখ্যার বারো আনা হইয়াও, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও, কেন্দ্রীয় শাসন-পরিষদে সংখ্যালঘিষ্ঠ। প্রদেশে প্রদেশে মুসলমানেরা পাইয়াছে weightage; যে যে প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, সেখানে তাঁহারা স্থানে স্থানে শত-করা ৩০০।৪০০ গুণ weightage পাইয়াছেন। আর যেখানে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া দাবি করেন, যেমন বাংলায়, সেখানেও হিন্দুর তুলনায় weightage পাইয়াছেন শত-করা ২৫ করিয়া। তিনি আরও দেখিলেন, কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করার ফলে সুদূর পেশোয়ার হইতে আসাম পর্য্যন্ত সকল প্রদেশেই মুসলমান প্রিমিয়ার বা প্রধান মন্ত্রী।

তিনি হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিলেন।

হিন্দু মহাসভার আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকিলেও বীর সাভারকর যোগদান করিবার পূর্ব্বে তাদৃশ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। বিপ্লবী সাভারকর হিন্দু মহাসভায় যোগদান করিয়া হিন্দু মহাসভার আন্দোলনে এক বিপ্লব ঘটাইয়া দিলেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহম্মদাবাদে অখিল-ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি। তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে যে নূতন ভাবধারার আমদানি করেন, উহা সত্য সত্যই ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের ন্যায় ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে দুকূলপ্লাবিনী, ভাব-সখ্য-সমৃদ্ধিকারী।

হিন্দু যখন মিথ্যা জাতীয়তার লোভে নিজেকে 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, তখন তিনি প্রশ্ন তুলেন—"হিন্দু কে ?" উত্তরে তিনি বলেন—

আসিন্ধু সিন্ধু পর্য্যন্ত্য যস্য ভারত ভূমিকা।
পিতৃভূঃ পুণ্যভূমিশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতিস্মৃতঃ॥

যিনি আসিন্ধু সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারতভূমিকে নিজের পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি বলিয়া স্বীকার করেন, তিনিই হিন্দু।

এই হিন্দুর "হিন্দুত্ব" যাহাতে বজায় থাকে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। হিন্দু মহাসভার আন্দোলনকে শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ইহা দেশীয় রাজ্যে, স্বাধীন রাজ্যে, ফরাসী-শাসিত ভারতে, পোর্টুগীজ-শাসিত ভারতে, সর্ব্বত্র প্রসারিত করিতে হইবে। মহাসভাকে হিন্দু-ধর্ম্ম-সভার নামান্তর করিলে চলিবে না; ইহাকে জীবন্ত হিন্দুরাষ্ট্র-সভায় পরিণত করিতে হইবে। মহাসভাকে সকল হিন্দুর সকল প্রকার ধার্ম্মিক, রাষ্ট্রিক ও নাগরিক সুখ-সুবিধার ও অধিকারের রক্ষকে পরিণত করিতে হইবে।—ইহাই হইল

মুসলিম লীগ ভারতবর্ষকে দুই ভাগ করিবার জন্য খোলাখুলি-ভাবেই ভারতের বাহির হইতে মুসলমান-জাতিকে আনিয়া মুসলিম ফেডারেশন গঠন করিয়া ভারতবর্ষে স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য স্থাপনের যে প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছে, সেই মুসলমান "সুয়োরাণী"কে বিশ্বাস করিবার সময় ইংরেজ যেন দুইবার করিয়া ভাবিয়া দেখেন। মুসলমানদের এই চক্রান্ত-প্রবণতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, এবং ইংরেজগণ হিন্দুকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য মুসলমানদের বিরোধী আন্দোলনকে যে উৎসাহ দিতেছেন, সেই ঢেঁকিই যেন কুমীর হইয়া না বসে। যাহা হউক, ইহা ব্রিটিশের চিন্তার বিষয়, তাঁহারাই তাঁহাদের নিজেদের সামলাইবেন। আমাদের চেষ্টার বিষয় ইহাই হইবে যে, আমরা ইংরেজের বা মুসলমানের কাহারও দাসগিরি আর করিব না; নিজের ঘরে—হিন্দুস্থানে—হিন্দুদের দেশে প্রভুর মত বাস করিতে চাই।

এ উদ্দেশ্যে আমাদের বর্ত্তমান কার্য্যক্রম কি হইবে ?

বহুবিধ কারণের মধ্যে উপরে আমরা যে কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারিয়াছি যে, বাস-ভূমির একত্ব—এই একমাত্র সাধারণ ভিত্তির উপর সমান অধিকারে সন্তুষ্ট হইয়া ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত একরাষ্ট্রীয় জাতি গঠন করিতে কখনও মিলিত হইবে না। অতএব, হিন্দু কংগ্রেস-ওয়ালারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-আন্দোলনের প্রারম্ভেই সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত যে ভুল করিয়াছেন এবং এই ধরনে ভারতীয় জাতি-গঠনের প্রচেষ্টা-মরীচিকার পশ্চাতে এখনও গোঁ ধরিয়া ছুটিয়া অনর্থক

হিন্দুজাতির স্বাভাবিক অভ্যুত্থানে বাধা দিয়া যে ভুল করিতেছেন, আমাদের হিন্দু সংগঠনকারীদের সেই গোড়ার ভুল প্রথমেই সংশোধন করিতে হইবে। জাতীয় জীবনপথের যে স্থানে, মারাঠা ও শিখ সাম্রাজ্যের পতনের সময়, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদিগকে রাখিয়া গিয়াছেন, আসুন, আমরা আবার সেই স্থান হইতে আরম্ভ করি। আত্মজ্ঞানী হিন্দুজাতির জীবন আহত হইয়া অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃতিতে মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তি সঞ্জীবিত ও সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দরাও কালের চিঠির যে কথাগুলি আমি ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি, আসুন, আমরা সেই কথাগুলি সদর্পে পুনরায় ঘোষণা করি যে, সিন্ধুনদ হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূভাগ হিন্দুস্থান—হিন্দুদের দেশ, আর আমরা হিন্দুজাতি—এই ভূমির অধিকারী। আমরা হিন্দু—আমাদের কাছে হিন্দুস্থান আর ভারতবর্ষ একই অর্থ, একই বস্তু। আমরা ভারতবাসী (Indian) বলিয়াই হিন্দু এবং হিন্দু বলিয়াই ভারতবাসী।

হাঁ, আমরা হিন্দুরা নিজেরাই একটা জাতি; কারণ ধর্ম্ম, জাতি, সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক একত্ব আমাদিগকে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ করিয়া একটি সমধর্ম্মসম্পন্ন জাতিতে পরিণত করিয়াছে, তদুপরি ভৌগোলিক সীমার একত্ব—এই বিশেষ সুবিধাও আমরা পাইয়াছি। আমাদের পিতৃভূমি, আমাদের পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের সহিত আমাদের জাতীয় সত্তা ওতপ্রোতভাবে জড়িত; এবং এ সকল তো আছেই, তাহা ছাড়াও, সর্ব্বোপরি আমরা সমস্ত হিন্দুরা 'এক হইতে চাই'—এই কারণেই আমরা একজাতি। যখন ত্রিশ কোটি লোকেরই এই এক মত, তখন আমাদের একজাতীয়ত্ব

অস্বীকার করিবার বা তাহার প্রমাণ চাহিবার অধিকারই কাহারও নাই।

ভারতবর্ষে আমাদিগকে সম্প্রদায় বলা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। জার্মানিতে জার্মানরাই জাতি, আর ইহুদীরা সম্প্রদায়। তুরস্কে তুর্কীরাই জাতি, আর আরবীয় বা আর্মেনিয়ানগণ একটা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়। সেইরূপ ভারতবর্ষে—"হিন্দুস্থানে"—হিন্দুরাই জাতি, আর মুসলমানরা একটা সম্প্রদায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে করাচীর অধিবেশনে মুসলিম লীগের নেতাগণ সুদেতেন-জার্মানের কথা উল্লেখ করিয়া হিন্দুগণকে শাসাইয়াছেন যে, হিন্দুদের নিকট তাঁহারা যে অসম্ভব দাবি করিতেছেন, তাহা যদি না মেটানো হয়, তবে তাঁহারাও স্বকার্য্যোদ্ধারের জন্য সীমান্ত-পারের মুসলমান স্বধর্ম্মীগণকে ভারতের ভিতর ডাকিয়া আনিবেন। এই ভীতি-প্রদর্শনের প্রত্যুত্তরে মুসলিম লীগের বন্ধুগণকে আমি বলিতে চাই যে, তাঁহারা যেন আপদ-শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জয়ধ্বনি না করেন। তাঁহাদের উদাহরণ দুই দিকেই খাটে। তাঁহারা শক্তিশালী হইয়া উঠিলে সুদেতেন-জার্মানদের ভূমিকা অভিনয় করিতে পারেন; কিন্তু আমরা হিন্দুরা যদি যথাসময়ে শক্তিশালী হইয়া উঠি, তাহা হইলে লীগপন্থী বন্ধুগণকে তৎপরিবর্ত্তে অন্য ভূমিকাও অভিনয় করিতে হইতে পারে।"

আহম্মদাবাদে সাভারকর যে ভাবধারার প্রবর্ত্তন করেন, তাহাই পরবর্ত্তী অখিল-ভারত হিন্দু মহাসভার নাগপুরের অধিবেশনে ও কলিকাতার অধিবেশনে পূর্ণতরভাবে বিকশিত করেন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে হিন্দুই একমাত্র জাতি (Nation), আর মুসলমান একটি সম্প্রদায় (Community) মাত্র। যাহারা হিন্দুকেও একটি সম্প্রদায়-বিশেষ

৮

মনে করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে সমপর্য্যায়ে ফেলিয়া রাজনীতি চর্চ্চা করেন, তাঁহারা গোড়াতেই মারাত্মক ভুল করেন। স্বদেশপ্রেমের সহিত সংস্কৃতিগত ও অতীত ইতিহাসগত ঐক্য অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মুসলমানগণ ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি ও অতীত ইতিহাসকে আপন মনে করিতে পারেন না। তজ্জন্যই তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা ইসলামের সংহতি ও অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত যুক্ত হইয়া ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃতিগত ঐক্য না থাকাতে শুধু ভৌগোলিক-সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রীয় ঐক্য রক্ষা করিবার চেষ্টা কিরূপে পুনঃ পুনঃ বিফল হইয়াছে। এইজন্যই পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভারতের স্বাধীনতার যে সংগ্রাম চলিয়াছে, ইহা শুধু হিন্দুরাই চালাইয়াছে; মুসলমানের ইহাতে কোন উল্লেখযোগ্য দান নাই—থাকিতেও পারে না।

তাঁহার নূতন ভাবধারা হিন্দুকে বুঝাইবার জন্য সাভারকর গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, জেলায় জেলায়, প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যেক বৎসরে অন্ততপক্ষে ৩০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করেন।

তাঁহার প্রবর্ত্তিত কার্য্যক্রম যে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী, তাহাও তিনি 'হাতে কলমে' দেখাইয়াছেন। মহাত্মা গান্ধী যখন ক্ষুদ্র রাজকোটের দেওয়ান সর্দ্দার বীরাবালার সহিত অহিংস সংগ্রামে ব্যস্ত ও ভারতের সর্ব্বপ্রধান দেশীয় রাজ্য 'নিজামের বিরুদ্ধে কিছু করিও না' বলিয়া ঘোষণা দিতেছিলেন, সেই সময়ে হিন্দুর ধার্ম্মিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য হিন্দু মহাসভা-পরিচালিত আন্দোলনে ১৫,০০০ হাজার হিন্দু স্বেচ্ছায় নিজামের মুসলমানী কারাবরণ করেন ও ভূতপূর্ব্ব তুরস্কের সুলতান

খালিফের বৈবাহিক নিজামকে হিন্দুর ধার্ম্মিক ও রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। যাঁহারা এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহাদের আমরা দাতে-প্রণীত 'ভাগনগর যুদ্ধ' পড়িয়া দেখিতে বলি।

সাভারকর বলেন যে, সরকার যেন সেন্সাসের সময় পার্ব্বত্য জাতিদের কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতিকে "হিন্দু" বলিয়া গণ্য করেন। ভারত-সরকার এই দাবি স্বীকার না করিলেও ইহার বিরুদ্ধে কিছু করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু বাংলা-সরকার বাঙালী হিন্দুকে শতধাবিচ্ছিন্ন দেখাইবার জন্য কেবলমাত্র হিন্দুর জাতি লিখাইবার নির্দ্দেশ দেন। নিখিল-বঙ্গীয় সেন্সাস বোর্ড ইহার প্রতিকারকল্পে সকল হিন্দুকে তাঁহার "জাতি"র স্থলে নিজেকে "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য আহ্বান করেন। সরকারী অত্যাচার ও অবিচার সত্ত্বেও, পদবী মুখোপাধ্যায় দেখিলেই তাঁহাকে জোর করিয়া ব্রাহ্মণ ধরিয়া লইবে, পদবী সেন দেখিলে বৈদ্য বলিয়া লিখিবে, এইরূপ করা সত্ত্বেও সত্তর লক্ষ হিন্দুকে সরকার "হিন্দু" বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্তও নিজেকে "হিন্দু" বলিয়া পরিচয় দিয়া বাংলা-সরকারের অপচেষ্টাকে বাধা দিয়াছেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের আদেশে বহু হিন্দু সেন্সাসে নিজের নাম লেখান নাই। এবারে (১৯৪১) যাহাতে সেইরূপ ভুল না হয়, তাহার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে 'সেন্সাস সপ্তাহ' পালন করিবার আদেশ সাভারকর দেন। ফলে যে কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুর ভাল হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরকারী চাতুরি সত্ত্বেও বাংলায় হিন্দুর অনুপাত প্রায় শত-করা ১ জন করিয়া (সূক্ষ্মভাবে ধরিতে গেলে হাজার-করা ৮ জন করিয়া) বাড়িয়াছে।

বাংলায় হিন্দু মহাসভার আন্দোলন ক্ষীণ ফল্গুপ্রবাহের ন্যায় বহিয়া

চলিতেছিল। বাঙালী হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার চেষ্টা সাধারণ হিন্দুর সহানুভূতির অভাবে তাদৃশ সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছিল না। বাংলায় হিন্দু মহাসভার কার্য্য আশাতিরিক্ত না চলার কারণ সম্বন্ধে সাভারকর জানিতে পারেন যে, নেতার অভাবই তাহার কারণ। বাঙালী হিন্দুকে তাহার বিপদ বুঝাইয়া দিতে তিনি নিজে সম্মত হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে খুলনায় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে সাভারকর বাঙালী হিন্দুকে যে বজ্রনির্ঘোষে আহ্বান দিলেন, সে ডাক বহু বাঙালীর মর্ম্ম স্পর্শ করিল। জ্ঞানবৃদ্ধ সার্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার অবসর ত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলেন ; অদ্ভুতকর্ম্মা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার কর্ম্মশক্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়াইয়া হিন্দুজাতির সেবায় নিয়োগ করিলেন ; নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতিকে বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য পূর্ব্ববঙ্গে শহরে শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; সনৎকুমার রায় চৌধুরী (ইনি বহুপূর্ব্ব হইতেই হিন্দু মহাসভার কার্য্য করিতেছিলেন) কর্পোরেশন পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার ষোল-আনা কর্ম্মশক্তি হিন্দুজাতির সেবায় নিয়োগ করিলেন। বহু কর্ম্মী ছুটিয়া আসিয়া হিন্দুমহাসভা-আন্দোলনে যোগদান করিলেন। বাংলায় এক নূতন ভাব-প্রবাহ আসিল।

তাহার পর দেশবন্ধু পার্কে ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে অখিল-ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে সাভারকর যে বাণী প্রচার করেন, তাহা বাংলায় হিন্দুমহাসভা-আন্দোলনকে ক্ষীণ ফল্গুপ্রবাহ হইতে ভাদ্রের গঙ্গায় পরিণত করে। অবশ্য ইহার অন্য কারণও আছে, যথা—বাংলায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কুফল, বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ও হিন্দুস্বার্থের প্রতি কংগ্রেসের ঔদাসীন্য। বাংলায় আজ

হিন্দু মহাসভার যে প্রাধান্য, তাহার মূলে সাভারকরের যথেষ্ট প্রভাব আছে। *

সাভারকর ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে উপর্য্যুপরি চারি বার অখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা অধিবেশনের সভাপতিত্ব করিয়াছেন। এবারেও (অর্থাৎ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে) হয়তো ভাগলপুরে করিবেন। উপর্য্যুপরি সাভারকরকে সভাপতিপদে বরণ করিবার হেতু কি? হিন্দুমনোবৃত্তি চিরকালই গণতান্ত্রিক, তথাপি সাভারকরকে বারে বারে সভাপতি করিতেছে কেন? হিন্দুর মধ্যে কি যোগ্য লোকের অভাব? না, হিন্দু বুঝিতে পারিয়াছে যে, "পরিত্রাণায় সাধুনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম" শীঘ্রই ভগবানের আবির্ভাব হইবে। আর যখনই ভগবানের আবির্ভাব হয়, তাঁহারই অগ্রদূতস্বরূপ বহু মহা-মানবের জন্ম হয়। সাভারকর এই সব মহা-মানবের অন্যতম। সাভারকরকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি ধীরভাবে পড়িতে হয়। নিম্নে আমরা তাঁহার ইংরেজী পুস্তকের নাম দিলাম।—

Hindu Sangathan
Hindutwa.
Hindu-Pad-Padsahi
Echoes from Andaman
Speeches

---

* বাঙালী হিন্দুর গৌরবস্থল সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয়ের দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কর্পোরেশনের নির্ব্বাচনে সুভাষবাবুর দল পাইয়াছিলেন ২১,৪৪২ ভোট; আর হিন্দু মহাসভা পাইয়াছিলেন ২০,২১৩ ভোট। বঙ্গীয় অ্যাসেম্বলির উপ-নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভা পাইয়াছেন ১১,১৫১ ভোট; আর তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছেন ২,৩২৭ ভোট।

সাভারকর তাঁহার কোনও বক্তৃতা "বন্দে মাতরম্" না বলিয়া উপসংহার করেন না। আমরাও তাঁহার জীবনী "বন্দে মাতরম্" বলিয়া উপসংহার করি। আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তিনি দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে থাকিয়া হিন্দুর উপকার করেন।

॥ বন্দে মাতরম্ ॥

